পিয়ারী

অবধূত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

পিয়ারীকে

১২।৩।'৬৮

এই লেখকের—

মরুতীর্থ হিংলাজ

বশীকরণ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

বহুব্রীহি

শুভায় ভবতু

দুই তারা

মিড় গমক মূর্চ্ছনা

কলিতীর্থ কালীঘাট

দেবারিগণ

ছুরি বৌদি

ক্রীম

মায়ামাধুরী

গাছটা আছে এখনও।

এই সেদিন গিয়েছিলাম গাছটাকে দেখতে। সত্যি বলতে কি, দেখে একটু হিংসেই হল। হিংসে ঠিক নয়, কেমন যেন বড্ড পর পর মনে হতে লাগল ওকে। প্রথমে তো চিনতেই পারি নি, চৌমাথায় পৌঁছে বেশ হকচকিয়ে পড়লাম। এসেছি তো ঠিক জায়গায়! এধার ওধার তাকিয়ে কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বুঝতে পারলাম, হাঁ ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি বটে। তার পর অবশ্য গাছটাকেও চিনতে পারলাম। চিনতে পেরেই মনটা কেমন কুঁকড়ে গেল। ইস্—কি প্রকাণ্ডই না হয়েছে! আবার গয়না পরেছে পায়ে, দুধের মত সাদা পাথরের মস্ত বড় একগাছা মল। মলগাছা পৌঁছেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। আহা কি বাহার! এক পায়ে মল পরে দাঁড়িয়ে আছে ধেড়ে খুকী! দেখে এমন হাসি পেল। হাসিও পেল দুঃখও হল। রাগও বেশ হল একটু। কারা করেছে ও কর্ম! কারা ওর পায়ে পাথরের বেড়ি লাগিয়েছে।

যারাই লাগাক বেড়িটা, ফলে কিন্তু ওর গুমোর যেন খুব বেড়ে গেছে। বাড়বেই, বাড়তে বাধ্য। হরদম যদি মানুষে পায়ে মাথা ঠোকে, তা হলে কার না মন গরম হয়। গাছটারও তাই হয়েছে। বিস্তর ভক্ত এখন ওর। গঙ্গাস্নান করে ফেরবার সময় ওর পাশ দিয়ে যেতে হবেই সকলকে। যেতে যেতে আধ মিনিটের জন্যে থেমে ঘটি বা কমণ্ডলু থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে ওর পায়ের শ্বেত পাথরের বেড়িতে কপাল ঠেকাচ্ছে। কেউ কেউ আবার ছুঁড়ছে দু-একটা পয়সা বা এক মুঠো ফুল বেলপাতা। বিশেষ ধরনের পোক্ত ভক্ত দু-এক জন হাতে শালপাতার ঠোঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তখন নজর পড়ল বৃষকাষ্ঠ সদৃশ একটি জীবের

ওপর। শুধু গা, কয়লার মত কালো রঙ, পরে আছেন হাত পাঁচেক লম্বা একখানি গামছা। গামছাখানিকে আবার কাছা দিয়ে পরা হয়েছে। আর আছে এক গোছা পৈতে তাঁর অঙ্গে। অঙ্গের বর্ণের দরুন পৈতের রঙটা খুবই খুলেছে। তিনি হরদম ছুটোছুটি করছেন সেই পাথরের বেড়িটার ওপর। ভক্তদের হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছেন শালপাতার ঠোঙা, গাছটার কাছে পৌঁছে ঠোঙাটা উপুড় করছেন একখানা থালায়। তার পর তাতে এক খাবলা ফুল বেলপাতা তুলে আবার ছুটে এসে ফেরত দিয়ে যাচ্ছেন ভক্তটির হাতে। অর্থাৎ গুরুতর রকমের ভোগ রাগও চলেছে। এতে কার না মেজাজ চড়ে!

তফাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে সত্যিই কেমন যেন মনটা কুঁকড়ে গেল আমার। ওটাকে ঠিক হিংসে বলা উচিত নয়। তবে বড্ড যেন পর পর বলে মনে হল গাছটাকে। তাই বেশ মুষড়ে পড়লাম।

গাছটা একবার একটু ফিরেও তাকাল না।

মানে—ফুরসত নেই। কারবারের সময় খদ্দেরের ওপর নজর রাখতে হয়, তখন কি আর অন্যদিকে তাকালে চলে।

বেশ, তা হলে একটু বসেই যাই। দুপুরের দিকে নিশ্চয়ই খদ্দেরের ভিড় কমবে। দুপুর গড়িয়ে গেলে কে আর আসবে গঙ্গাস্নান করতে। সেই ফাঁকে নিরিবিলিতে হয়তো একটু-আধটু আলাপ করবে ও। চিনলেও হয়তো চিনতে পারে। দেখাই যাক্।

শ্বেত পাথরের বেদীটার পেছন দিকে নামালাম ঝোলা-ঝাপটি কাঁধের। নামিয়ে বসলাম উঠে বেদীর ওপর। শরীর জুড়িয়ে গেল, ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাতে চোখ দুটোও জুড়ল। আঃ—কি রূপই খুলেছে। নীলে নীল হয়ে আছে ওপরটা, ঠিক যেন একটা মস্ত বড় চেপটা ছাতা। একটু পরে মনে হল, নীলের ভেতর থেকে হলদে আভা ফুটে বেরচ্ছে। নীলের অন্তরে হলদে, নীলে হলুদে মেশানো ফিকে আঁধার। ভাবটি খুবই গায়ে পড়া গোছের। যেন বোবা

ভাষায় বলা হচ্ছে—এসেছ, বসো একটু, ঠাণ্ডা হয়ে নাও, কোনও আপত্তি নেই। আহ্বানও নেই, তাড়ানোও নেই, আছে শুধু নীলে হলুদে মেশানো রঙের স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু। তাও খুব আলগোছে স্পর্শ, ওতে শরীর জুড়লেও মন ভরে না।

তা তাই সই, এসেই যখন পড়েছি, তখন একটু বসেই যাই বসে বসে দেখতে লাগলাম ওর বড়মানুষী চাল। অনায়াসে প্রণাম নিচ্ছে সকলের, আর আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে। যেন বুঁদ হয়ে আছে বড় হওয়ার নেশায়। কিংবা এ কথাও বলা চলে, নিজের রূপ যৌবনের দিকে তাকিয়েই মশগুল হয়ে আছে। অন্যদিকে নজর দেবার সুযোগই পাচ্ছে না।

ওর নাম কৃষ্ণচূড়া, ওর পড়শীরা বলে গুল-মোর। বেশ ঘরোয়া নামটি—গুল-মোর, কি রকম যেন বেশ নিটোল গোছের নাম। কৃষ্ণচূড়া—নামটিও মন্দ নয়, তবে বড্ড পোশাকী পোশাকী গন্ধ। তা পড়শীরা পোশাকী নাম পছন্দ করবে কেন। তাই তারা আদর করে ওকে গুল-মোর বলেই ডাকে। আদর করে বলেই না সাদা পাথরের বেদী বাঁধিয়েছে ওর চারিদিকে। গুল-মোরের পায়ের কাছে জল-কাদা জমে থাকবে, এ কি একটা কথা হল! ছিমছাম গুল-মোর ফিটফাট হয়ে থাকবে, তবেই না আরাম। গুল-মোর আরামে থাকলে তার কাছে গিয়ে বসলে আরামে চোখের পাতা বুজে আসবে। এইটুকুও তো কম কথা নয়।

আমারও চোখের পাতা বুজে এল। চেষ্টা করলাম সজাগ থাকবার জন্যে। হেঁরে গেলাম, ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে আর আলগোছে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে গুল-মোর আমায় ঘুম পাড়িয়ে ছাড়লে।

আসলে ঘুমোই নি কিন্তু। চোখ বুজে শুয়ে মজা দেখছিলাম। দেখছিলাম, গরুর গাড়ির চাকা বানাবার অদ্ভুত কায়দা। সম্বলের ভেতর পাঁচ-সাত হাত লম্বা করাত কয়েকখানা আর গোটা কতক

চেপটা মাথা কুড়ুল। বড় বড় গাছ চেরা হচ্ছে করাত দিয়ে, তার পর সেই চেপটা-মুখো কুড়ুলের বাঁট ডান বগলে চেপে ধরে ঝুড়তে ঝুড়তে মাপসই করা হচ্ছে। ঠিক ঢোলের মত দেখতে একটা গুঁড়ির গায়ে ছেঁদা করে আট খণ্ড কাঠ চারিদিকে ঠুকে দেওয়া হল সেই কুড়ুলেরই পেছন দিয়ে। তার পর সেই আট হাতের আগায় খানকয়েক চেপটা কাঠ লাগানো হল। ব্যস্, দাঁড়িয়ে গেল একখানা আস্ত গরুর গাড়ির চাকা। একেবারে জলবৎ তরলং ব্যাপার। চাই শুধু সেই অদ্ভুত-দর্শন কুড়ুল একখানি। হুবহু কোদালের মত দেখতে, মাটিতে বসিয়ে রাখলে কোদালের মত বসে থাকতে পারে। বাঁটের আগাটা ডান বগলে চেপে ডান হাতেই গোড়াটা ধরে বাঁ হাতে কাঠখানা দাঁড় করিয়ে রেখে স্রেফ ঝুড়ে যাও। দেখতে দেখতে গরুর গাড়ির চাকায় যা যা লাগে সব তৈরী হয়ে যাবে। তখন ঐ কুড়ুলের উলটো পিঠ দিয়ে লাগাও ঘা, এটার সঙ্গে ওটা জুড়তে জুড়তে যতক্ষণ না ঠিক গোল হচ্ছে ততক্ষণ ঠুকে যাও। গোল হলেই গড় গড় করে গড়াতে শুরু করবে, কোথাও আটকাবে না।

বাঁ দিক থেকে রাস্তাটা এসে মিশেছে যেখানে, ওখানেই ছিল মস্ত বড় একটা টিনের চালা। সেখানে সাজোয়ান সব মানুষ দিন রাত গরুর গাড়ির চাকা বানাত। চালার এক ধারে জ্যান্ত মোষের মত দেখতে একটা হাপর ছিল। মোটা লোহার পাত গোল করে চাকায় লাগানো হত সেখানে। লোহার বেড়টাকে টকটকে লাল করে পুড়িয়ে তার ভেতর চাকাটাকে ঢুকিয়ে ঢালো জল। ঠাণ্ডা হল তো আটকে গেল। এমন আটকাল যে চাকা ভাঙবে তবু লোহার বেড় খসবে না। তবে ক্ষয়ে যাবে, চাকা যত গড়াবে লোহা তত ক্ষইবে। ক্ষয়ে পাতলা হয়ে খসে পড়বে চাকার গা থেকে। তখন আবার নিয়ে এলেই হল কারখানায়, আর একখানা লোহার বেড় পুড়িয়ে লাল করে সেঁটে দেবে তার অঙ্গে। যাও, গড়াও গে যত পার, কোনও চিন্তা নেই।

কত শত চাকা যে তৈরী হয়েছিল সেই কারখানায়, কে তার

হিসেব রাখে! চাকাগুলো হয়তো এখনও রাস্তায় রাস্তায় গড়াচ্ছে। কিন্তু সেই মানুষগুলো গেল কোথায়! শুধু পায়ের জোরে আর হাতের কায়দায়—আস্ত গাছকে কেটে কুটে চাকা বানিয়ে ছেড়ে দিত যারা, তারাও কি শেষ পর্যন্ত গড়াতে নামল নাকি! নিজেরাও বুঝি গড়িয়ে চলে গেল গড়গড় করে। আশ্চর্য নয়, কিছুই আশ্চর্য নয়। টিনের চালাটা পর্যন্ত বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চারতলা এক অট্টালিকা। নীচে সারি সারি দোকান। প্রথমেই পায়ের ব্যাপার, তার পরেই একেবারে মাথায় উঠে এল। জুতোর দোকানের পাশেই চুল ছাঁটাই হচ্ছে। তার পর রয়েছে ডাক্তারখানা, তার পর আসল গিনি গোল্ড। গিনি গোল্ডকে স্পর্শ করছে রঙ্‌বেরঙের শায়া। শায়ারা শেষ হচ্ছে মোগলাই ডবল পরটার গায়ে। আর কি চাই! অট্টালিকার দোতলা তেতলা চারতলায় যাঁরা বাস করছেন, তাঁদের জন্ম মৃত্যুর মাঝখানের সময়টা যাতে পরম নিশ্চিন্তে কাটে, তার চরম বন্দোবস্ত রয়েছে পায়ের তলায়। অর্থাৎ কি না, ঐ অট্টালিকাবাসীদের জীবনে—জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। আহা—কি আরাম! জীবনে ওঁদের কোনও প্রয়োজনে এতটুকু গড়াতে হবে না!

একদা কিন্তু ঠিক ঐখানেই চাকার কারখানাটা ছিল। শত সহস্র চাকা গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে গেছে ওখান থেকে। যারা বানাত চাকাগুলো, তারাও যে কোথায় চলে গেছে গড়িয়ে, কে তার পাত্তা রাখে! এখন আর ওখান থেকে কিছুই গড়ায় না। নিরুপদ্রবে নিশ্চল হয়ে টিকে আছে সবই। বাঃ কি চমৎকার!

চমৎকার কথাটাকে তাজ্জব বানিয়ে ছেড়েছিল জগ্‌মোহন। ও বলত—বাঃ, কা তাজ্জব! নিতান্ত সাদামাঠা ব্যাপার, আকছার যা ঘটে সকলের নাকের ডগায়, জগ্‌মোহনের কাছেও যেটা একান্ত পুরনো পচা ব্যাপার, তাতেও ও তাজ্জব বনতে ছাড়বে না। মুদ্রাদোষ

আর কি, যখন তখন যেখানে সেখানে চোখ দুটো গোল করে বলে বসল—বাঃ—কা তাজ্জব! জগ্‌মোহনের কাছে দুনিয়াখানায় যা কিছু আছে বা যা কিছু ঘটছে, সবই তাজ্জব কাণ্ডকারখানা। একমাত্র তাজ্জব রস ছাড়া অন্য কোন রসের স্বাদই জানত না ও। জানা সম্ভবও ছিল না, হরদম খইনি খেলে আর থুতু ফেললে মুখের কি আর সাড় থাকে।

মুখের সাড় থাকুক না থাকুক, প্রাণে কিন্তু ওর সাড়া জাগত চট করে। তখন চট করে এমন সব কাণ্ড করে ফেলত, তাতে তাজ্জব বনা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকত না। আকাট আকখুটের মত খাঁ করে একটা কিছু করে বসলেই হল। সামলাও তখন কি করে সামলাবে। উজ্জয়িনীতে সেবার এমন হাঙ্গামা বাধিয়ে বসল যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা দায়। কোথা থেকে এসেছিলেন এক সর্বশক্তিমান সাধু রাশীকৃত সোনাদানা হীরে জহরত নিয়ে। সিপ্রার অপর পাড়ে নিরিবিলি জায়গায় গণ্ডা গণ্ডা তাঁবু খাটিয়ে প্রচুর শিষ্য-শিষ্যা নিয়ে সাধু মহারাজ অবস্থান করছিলেন। নিরিবিলিতে বাস করাটা ষোলআনা সার্থক করার বাসনায় গোটা দশেক মাইক যন্ত্র যোগে হরদম গীত বাদ্য বক্তৃতা হোম পূজা আরতি সম্পন্ন হচ্ছিল তাঁর আস্তানায়। সারা মেলাটার মানুষ হুড়হুড় করে যাচ্ছিল আসছিল তাঁর কৃপা লাভ করে। অকস্মাৎ বেধে বসল এক হুজ্জত। গোরক্ষপুর জেলার একটি ভদ্রলোক হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেড়ালেন একদিন মেলাময়। তাঁর স্ত্রীটি সাধু দর্শন করতে গিয়ে আর ফিরতে চাইলেন না। সাধু মহারাজের শ্রীচরণেই আশ্রয় নিলেন।

নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাপার এটা, যথেষ্ট পবিত্র একটি ঘটনা। সুতরাং কে কান দেয় এ সব ব্যাপারে। আর কুম্ভ মেলার মত মহান্ মচ্ছবে কে কার দিকে নজর দিতে পারে। জগ্‌মোহনের কিন্তু নজর এড়াল না। বলে উঠল—কা তাজ্জব! বলে গোরক্ষপুর জেলার ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে একান্ত নির্জনে চলে গেল।

প্রমাদ গণলাম। তার আগেই যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছিলাম

জগ্‌মোহনের। বুঝতে বাকা রইল না যে তাজ্জব একটা কিছু না ঘটিয়ে জগমোহন ফিরবে না। তাঁবু-বিহীন তাঁবেদার শ্রেণীর সাধুদের ওরকম বৃহৎ ব্যাপারে নাক-গলানো নিষেধ। গাছতলায় কম্বলের টুকরো বিছিয়ে পরম নিশ্চিন্তে কুম্ভ-পূর্ণ পুণ্যার্জন করছিলাম। হাজার হাজার তাঁবেদার শ্রেণীর সাধুর জন্যে কোথাও না কোথাও ভাণ্ডারা হচ্ছেই। ভাল লোকেরা দান-ধ্যান করার উদ্দেশে কুম্ভমেলায় যায় —আর তাদের উদ্দেশ্য যাতে পূর্ণ হয় সেই জন্যে যায় সাধুরা। তাই কুম্ভমেলার দিনগুলো নিরেট নির্ভাবনায় কাটে। জগ্‌মোহন ঝগড়া বাধালে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে বললে, তখনই তল্পি গোটাতে হবে। রাজী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন একটা মতলব ভেঁজেছে জগ্‌মোহন যে না পালালে ধরা পড়ে হাড়গোড় চূর্ণ হবে। অগত্যা খুব ঘটা করে আশপাশের সাধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তখনই স্টেশনে চলে আসতে হল। কুম্ভমেলায় সাধুদের টিকিট কাটার হাঙ্গামা নেই, সাধুদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করেই রেলওয়ালারা বিস্তর মুদ্রা কামান। সর্বপ্রথম যে গাড়িটা ছাড়ল উজ্জয়িনী থেকে তাতেই চেপে বসলাম দুজনে। মাইল খানেক গিয়েই গাড়ি থামল। জখমী পুল একটা পার হতে হবে। জগ্‌মোহনের নির্দেশে সেখানেই নামতে হল। নামবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা চলতে শুরু করল আবার ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে পুল পার হয়ে চলে গেল।

তখন বললে জগ্‌মোহন মতলবটা! আমাকে সেখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে। জগ্‌মোহন ফিরে যাবে মেলায়, গিয়ে গোরক্ষপুরের পরিবারটিকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে আসবে।

বোঝাতে চেষ্টা করলাম ওকে, কি দরকার ও সব ব্যাপারে নাক গলিয়ে। শান্তিতে যদি সাধুগিরিটা চালাতে বাসনা থাকে, তা হলে অনবরত জপ কর—'হোক না কেন লাঠালাঠি খাক না কেন বাঘে, কোন্ শালা বা জাগে।' সুবুদ্ধি দিলেও কোনও ফল হবে না জানতাম। জগ্‌মোহন তৎক্ষণাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল।

এই একটিবার তাকে আদেশ দিতেই হবে, আর কখনও সে কোনও ব্যাপারেই মাথা ঘামাবে না। অগত্যা আদেশটি দান করতে হল। সাধুগিরি শুরু করে বহুবার হতাশ হবার পর ঐ একটিমাত্র চেলা জুটিয়ে ছিলাম। বড় ভয় ছিল, সবে ধন নীলমণি চেলাটিকে হারাবার। হিসেব করে দেখলাম, চেলা এমনিতেও গেছে অমনিতেও গেছে। আদেশ না দিলে তখনই খোয়া যাবে, আদেশ দিলে ফিরলেও ফিরতে পারে যদি আমার বরাতের জোর থাকে। অতঃপর সত্যিকারের মহাপুরুষের মত আচরণ করাই শ্রেয় বিবেচনা করে ওর মাথার ওপর ডান হাত রেখে একটু জপ করে বললাম—আচ্ছা, যা বেটা, ভবানী তোকে রক্ষা করবে। কিন্তু খেয়াল রাখবি, এই শেষ। এর পরে আর কখনও পরের হুজ্জতে মাথা দিতে পারবি না। ভবানীর কৃপা যদি পেতে চাস, তা হলে বাজে ভাবনা ছাড়তে হবে। যাক না কেন ছুনিয়াখানা পুড়ে ছারখার হয়ে, সব ভবানীর ইচ্ছে। তাতে তোরই বা কি আমারই বা কি। উত্তম উপদেশটি শুনে পরম হৃষ্টচিত্তে জগ্‌মোহন তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করলে। চেলার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ছোট নদীটার তীরে একটা ঝোপের ভেতর আত্মগোপন করে বসে রইলাম।

জগ্‌মোহন ছিল আমার প্রথম চেলা। বড় দুঃখ কষ্ট ভোগ করে চেলাটি জুটেছিল বরাতে। কিন্তু টিকল না বেশী দিন। পোড়া কপালে বেশী দিন সুখ সইবে কেন। তা ছাড়া যে মানুষ দিবারাত্র তাজ্জব বনবার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে, কে কাঁহাতক তাকে আগলে রাখতে পারে। চেলা হারানোর দুঃখটা আমায় ভোগ করতেই হল।

তবে সেবারে নয়। উজ্জয়িনীর কুম্ভে হারাই নি জগ্‌মোহনকে। সেই রাত্রেই ও ফেরত এসেছিল। গোরক্ষপুরের পরিবারটি ফিরে গিয়েছিল গোরক্ষপুরে। সংসার ত্যাগ করার নেশাটা কেটে গিয়েছিল তার। আর সেই নিরিবিলি-প্রিয় সম্ভ্রান্ত সাধুটি, তিনিও কুম্ভ থেকে

পুণ্যের আণ্ডিল বেঁধে ফিরে গিয়েছিলেন স্বস্থানে। অনেকদিন পরে নাসিকে গিয়ে তাঁর দর্শন লাভ করি। নামজাদা এক রামাইৎ আখড়ার অধীশ্বর তিনি, অতি কঠোর তপস্বী। ভক্তরা বলল, বছর কতক আগে উজ্জয়িনীতে কুম্ভস্নানে গিয়ে মোহন্ত মহারাজ সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছিলেন প্রভু লছ্‌মনজীর। লছ্‌মনজী আনন্দ পান নাসিকাচ্ছেদন করে। তাই মোহন্ত মহারাজ নিজের নাসিকাটি স্বহস্তে কেটে লছ্‌মনজীকে নিবেদন করেছিলেন।

ভক্তি যাঁকে করা হয়, তিনি যদি ফস্‌ করে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে ফেলেন ভক্তকে, তা হলে কি আর রক্ষে আছে। ভক্তটি তখন এমনই বেপরোয়া হয়ে পড়ে যে নিজের মুণ্ডটা নিজে কেটে ভক্তি-ভাজনকে উপহার দিয়ে ফেলে। সামান্য একটা নাক, ও তো একান্ত তুচ্ছ ব্যাপার। স্মরণ কর প্রভু অঞ্জনানন্দনেরে। আপন হাতে আপন বুকখানা ফেড়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি—যো রাম দশরথ কা বেটা, ও রাম ঘট্‌ঘট্‌ মে লেটা।

শিষ্টাচার হল, যে কোনও প্রসঙ্গে ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাবল হনুমানের নামটি উঠে পড়লেই তৎক্ষণাৎ সেই প্রসঙ্গটিতে ধামা-চাপা দিতে হবে। কাজেই নাসিকের মোহন্ত মহারাজের নাসিকার কথাটি এখানেই থাক। কিন্তু ভক্তি আর ভক্তের প্রসঙ্গে একথাটা না বললে চলছে না যে আমার চেলা জগ্‌মোহনের ভক্তিও নেহাত সামান্য ছিল না। তবে ভক্তির দৌরাত্ম্য থেকে যতটা সম্ভব আমায় বাঁচিয়ে চলত সে। আমাদের প্রথম পরিচয়টাই এমন একটা উদ্ভট পরিস্থিতির মধ্যে ঘটে গিয়েছিল যে ভক্তির মত তুলতুলে জিনিস সেখানে উপস্থিত থাকলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত। পুড়ছিল কি না সবই, মানুষ পুড়ছিল, মেয়ে-মানুষ পুড়ছিল, মানুষ মেয়েমানুষের কাচ্চাবাচ্চা পুড়ছিল। আস্ত একটা নুলিয়া পল্লী পুড়ে ছাই হচ্ছিল। উড়িষ্যার এক স্বাধীন নরপতি পোড়াচ্ছিলেন পল্লীটাকে। তাঁর মহাতেজা পূর্বপুরুষ একজন প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন রঙ্গনাথজীর মন্দির একটি। মন্দিরের সেবাদাসীর চাহিদা মেটাবার জন্যে নুলিয়া পল্লীটিকেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নুলিয়ার ঘরে সুন্দরী মেয়ে দৈবাৎ এক-আধটা জন্মায়। দৈবাৎ যদি কোনও উচ্চ বর্ণের উচ্চ বংশের বংশধর কৃপা করে ফেলেন কোনও নুলিয়া রমণীকে, তবেই দৈবাৎ একটা সুন্দরী মেয়ে জন্মাতে পারে। এতগুলো দৈবাৎ সংযুক্ত হয়ে যে মেয়ে জন্মাল, তার ওপর শ্রীমন্দিরের অধিকার। সেই অধিকার মানতে চায় নি নুলিয়ারা। মন্দিরের অধিকার বজায় রাখার অধিকার নরপতিকে বর্তায়। রাজা ধর্ম রক্ষা করবেনই। অতএব রাজধর্ম পালনের জন্যে নুলিয়া পল্লীতে অগ্নি-সংযোগ করতে হল তাঁকে। তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে আবার সাগরের বাতাস। ফলে ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে তামাম পল্লীটা অগ্নিশুদ্ধ হয়ে গেল।

সবে রথযাত্রা সমাপ্ত হয়েছে। সমাগত সাধু সন্ন্যাসীরা শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন। সে বছর আমিও জুটেছিলাম রথের মেলায়। রথ দেখে সোজা দক্ষিণ দিকে পা চালিয়েছিলাম। দিন সাতেক পরে যেখানে রাত্রি-যাপন করছিলাম, সেখানে ঘটল ঐ দুর্ঘটনা। ঘটল তো ঘটল, তাতে আমার গায়ে তো আর ফোসকা পড়ল না। শ্রীভগবান শ্রীশ্রীগীতায় যে মহাবাণী দান করে গেছেন, তাই স্মরণ করে পরদিন প্রভাতে—নিজের পথে পা বাড়ালাম। হে অর্জুন, আমার মুখ বিবরে লক্ষ্য করে দেখ, অহরহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে আমি চর্বণ করছি। নুলিয়া পল্লীতে যারা বাস করত, তারা যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরের সম্পত্তি নয়, তখন হোক না চর্বিত, তাতে আমার কি গেল এল। এই ধরনের একটি অতি উচ্চাঙ্গের নির্লিপ্ততায় হৃদয় পূর্ণ করে খানিকটা এগিয়েছি, হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে সামনে আবির্ভূত হল শ্রীভগবানের অতি বিদকুটে এক অবতার। আপাদমস্তক কালিমাখা দিগম্বর মূর্তিটিকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠেছিলাম আর কি। সেই মুহূর্তে কানে গেল শিশুর কান্না। হকচকিয়ে তাকাতে লাগলাম

চারিদিকে। মেঠো পথ সিধে চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। দুধারে ধান জমি, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে সবুজ সমুদ্র, সামনে সেই দিগম্বর ছাড়া কোথাও একটিও প্রাণী নেই। শিশুর কান্না আসে কোথা থেকে! ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি!

অচিরাৎ সংশয়ের নিরসন হল। সামনে দণ্ডায়মান পঞ্চভূতাত্মক ভূতটি ভাঙা গলায় বললে—"মহারাজ, পুরীতে আপনাকে আমি দেখেছি। গোবর্ধন মঠের সামনে আপনার আসনের কিছু দূরে আমি ছিলাম। বড় বিপদে পড়ে গেছি। রাত্রে একটা মুলিয়া পল্লীতে আগুন লাগে। আগুন নেভাতে গিয়েছিলাম সেখানে। কতকগুলো লোক লাঠি শড়কি নিয়ে ঘিরে ছিল পল্লীটা, যাতে একটা প্রাণীও না পালিয়ে এসে রক্ষা পায়। তাদের মধ্যে একটাকে কাবু করে ঢুকে পড়ি পল্লীটার ভেতর। একটা মা আর তার বাচ্চাকে টেনে বার করে আমি অন্য দিক দিয়ে। মা'টা খুব পুড়ে গিয়েছিল, সে মরে গেল। বাচ্চাটা বেঁচেছে। তাকে নিয়ে এতদূর পালিয়ে এসেছি। এখন করি কি! আমার কাপড়খানাও পুড়ে গেছে। এই অবস্থায় যাই কোথায়!" আর বলতে পারল না, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার চেলা লাভ হল। বাচ্চা সমেত চেলাটিকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সরে পড়লাম। সামনে পাওয়া গেল একটা খাল, তাতে নেমে গা মাথা মুখের কালি ধুয়ে নিল চেলা। একখানি মাত্র ফালতু বস্ত্র ছিল ঝুলিতে—সেখানি তাকে দান করলাম। ব্যস—তখন আর পথ চলতে বাধা কোথায়!

বাধা সঙ্গেই ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন। ঘুম ভাঙতেই তার খিদে পেয়ে গেল। বছর খানেকের মেয়ে একটা, ক্ষুধা জয় করবার যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেও কিছু বুঝবে না। অগত্যা গ্রামের মধ্যে ঢুকতে হল। এবং তৎক্ষণাৎ সহৃদয় গ্রামবাসীরা ঘিরে ধরল খুন করবার জন্যে। জলজ্যান্ত দুটো ছেলে-চোর ধরেছে তারা, ছেলে-চোরকে খুন না করে কে ছেড়ে দেয়।

খুনটা আর হতে হল না। সহৃদয় মানুষ সর্বত্রই দু-চারটি থাকে। সেই গ্রামেও ছিল। তাঁরা যখন দেখলেন, গ্রামের ছেলেদের হাতের সুখ যথেষ্ট হয়েছে, তখন অন্য মতলব দিলেন। কাছেই জমিদারের কাছারি, ছেলে-চোর দুটোকে কাছারিতে উপহার দিলে কাছারির কর্তারা খুশী হবেন। তাঁদেরও হাত-পা আছে, সে হাত-পাগুলোরও ক্ষুধা মিটুক।

অতঃপর আচ্ছা করে বেঁধে ছেলে-চোর দুজনকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল কাছারিতে। অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ। কাছারির কর্তা বাচ্চাটিকে কেড়ে নিয়ে আমাদের দুজনকে পঁচিশটা করে টাকা আর এক জোড়া করে কাপড়-চাদর দিয়ে কাছারির গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিকটবর্তী স্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। কথা দিতে হল তাঁকে যে কোনও কালে কখনও আমরা আর তাঁর সঙ্গে দেখা করব না। কারণ বাচ্চাটিকে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নিজেদের বাচ্চা বলে চালাতে চান। তাঁদের ছেলেপুলে হয় নি। ঐ বাচ্চাই তাঁদের বাচ্চা হল, কিন্তু বড় হয়ে ও যেন না জানতে পারে ওর সত্যিকারের পরিচয়।

দায় পড়েছে আমাদের আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার। গাড়িতে চড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বাপস্—পরের বাচ্চার জন্যে আর একটু হলে প্রাণটাই গিয়েছিল আর কি!

প্রাণটা গেল না, উপরন্তু বহুদিনের একটি সাধ মিটল। চেলা লাভ ঘটে গেল হঠাৎ। চেলার মত চেলা যাকে বলে। পাছে খোয়া যায়, এই ভয়ে চোখের ঘুম ঘুচে গেল। চারিদিকে হাঁ করে রয়েছে কি না হাভাতের গুষ্টি, এ ওর ও তার চেলা ফুসলে মরছে। একটু অসাবধান হলেই ফুস্ যাঃ। উড়ে গেল চেলাটি। বেশী দূরে গেল না, পাশের বাড়ির দাঁড়ে বসে ছোলা কাটছে। দূর হয়ে যেত তো আপদ যেত, কিন্তু নাকের ডগায় আর একজনের চেলা বনে ঘুরঘুর করবে, এটা সত্যিই অসহ্য এই অসহ্য দগ্ধানির ভয়ে অসহ্য উদ্বেগে চেলা নিয়ে দিন কাটতে লাগল।

তারপর অবশ্য চেলাটির ওপর আস্থা এসে গেল। ক্রমেই টের পেলাম, চেলাটির হৃদয়ে আর যাই থাক, চটচটে ভক্তিরস একটুও নেই। সুতরাং চট করে অন্য কারও গায়ে আটকে যাবারও ভয় নেই। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

ঝাড়া আড়াইটা বছর জগ্‌মোহন চেলাগিরিটা চালিয়েছিল। তার পর হঠাৎ যে ভাবে একদিন তাকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পেয়েছিলাম, তেমনি আর এক নিদারুণ দুর্ঘটনায় টপ্‌ করে সে খোয়া গেল। সেই থেকে চেলা করাটার ওপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। চেলার মোহও দূর হয়ে গেছে মন থেকে। কি করে কি হল, আগে সেইটুকুই বলে নিই।

জগ্‌মোহন নামটা আমারই দেওয়া। যথাবিহিত শাস্ত্রাচার পালন করে দিনক্ষণ দেখে ওর মস্তক মুণ্ডন হল। পাঁচটি দণ্ডী স্বামীকে সদক্ষিণা ভোজন করানো হল। তার পর ও নবগুণ ধারণ করলে। এই সমস্ত প্রাথমিক কর্মগুলি সম্পাদন করা গেল উত্তরকাশীতে। তিন মাস পরে বদরীনারায়ণে পৌঁছে অলকানন্দার জলে সেই নবগুণ ভাসিয়ে দিয়ে ও ষোল আনা সন্ন্যাসী হল। নাম হল, জগ্‌মোহন স্বামী। নামটা খুব পছন্দ হল ওর। তবে নামের সঙ্গে যে উপদেশ-টুকু দান করলাম, সেটা বোধ হয় তেমন মনে ধরল না। বললাম—"শুন্ বেটা, এই যে সাধুদের নামের শেষে আনন্দ কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়, এর একটা উদ্দেশ্য আছে। সাধুরা আনন্দে থাকবেন। তাঁরা যেখানে উপস্থিত হবেন সেখানেও আনন্দ উথলে উঠবে, তবেই ঐ আনন্দ নামটা দেওয়া সার্থক হয়। পেঁচামুখো সাধু, মুখদর্শন করলেই মানুষের মেজাজ খিঁচড়ে যায়, এমন হলে ঐ আনন্দ নাম নেওয়াই বৃথা। জগৎকে যিনি আনন্দ দান করেন, তিনিই সত্যিকারের সাধু। অর্থাৎ জগৎ যাঁকে দেখে মোহিত হয়, তিনি জগদানন্দ স্বামী। স্বামী মানে অধিপতি। তাই স্বামীজীদের মহারাজ বলে সকলে।

নাই বা রইল রাজত্ব, তবু মহারাজা। এইটুকু মনে রাখিস, ব্যস—তা হলেই হল। দুনিয়ায় ন্যায় অন্যায় সুখ দুঃখ ভালমানুষি শয়তানি সব থাকবে। তুমি কিন্তু কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারবে না। জড়িয়ে পড়লেই দুঃখ, দুঃখ হলেই নিরানন্দ। নিরানন্দ হলেই তুমি আর সাধু রইলে না। তোমার মর্জি মত ভবানীর সংসার চলবে না। ন্যায় অন্যায় সুখ দুঃখ সব ঝুট, সব মায়া। যাও, জগদানন্দ স্বামী না হয়ে তুমি জগ্‌মোহন স্বামী হলে। জগৎ যেন তোমায় দেখে মোহিত হয়।"

জগ্‌মোহন মন দিয়ে শুনল সবটুকু। তার পর দু হাতে আমার গোড় স্পর্শ করে রুটি পাকাতে চলে গেল। আশা করেছিলাম, উপদেশামৃতটুকু হয়তো নির্বিবাদে গলাধঃকরণ করতে পারবে না। কা তাজ্জব দিয়ে শুরু করবে তর্ক। কিছুই বলল না দেখে আমিই একটু তাজ্জব বনে গেলাম। জগ্‌মোহনের মত জলজ্যান্ত একটা মানুষ সত্যিই মরে গেল না তো। সাধুত্বের সুধা কি ইতিমধ্যেই ওর মনটাকে অসাড় বানিয়ে ছাড়লে। মনটা বড়ই দমে গেল, জ্যান্ত একটা মানুষকে খুন করলে মন দমবেই। মন তো আর জামসেদপুর থেকে বানিয়ে আনা নয়।

জগ্‌মোহনের মনও কাঞ্চননগুরে ছুরির ফলা নয়। মরচে ধরতে বেশীদিন দেরি হল না। মস্তকমুণ্ডন নবগুণ ধারণ এবং যথেষ্ট গুরু-গম্ভীর মন্ত্রপাঠসহ নবগুণকে অলকানন্দায় বিসর্জন দান, এতগুলো অনুষ্ঠানের শান-পালিশেও ওর মনটা যে কাঁচা সেই কাঁচাই থেকে গেল। কয়েকদিন পরেই তার প্রমাণ মিলল। কয়েকটি যাত্রী একটা চটিতে বিষ খেয়ে পড়েছিল। যাত্রা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এক সাধু তাদের সঙ্গী হন। সাধুটির সেবা করতে করতে নারায়ণ দর্শনে চলছিল তারা। মওকা বুঝে একদিন স্বহস্তে ভোগ বানিয়ে ভগবানকে নিবেদন করে ভক্তদের প্রসাদ দান করলেন সাধুজী। এবং সেই রাত্রেই তাদের যথাসর্বস্ব গ্রহণ করে একদম ভারমুক্ত করে দিয়ে

অন্তর্ধান করলেন। বহু বেলায় চটিওয়ালা বিস্তর চিল্লাচিল্লি করেও যাত্রীদের ঘুম ভাঙাতে পারল না। দিন দু-এক পরে তারা জাগল। চোখ মুখ হাত পা এমন ফুলে উঠেছে যে উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। তাই তারা বসে আছে। একরকম উপোস করেই আছে বলা চলে। যে সব যাত্রী সেই চটিতে থামে, তারা যদি দয়া করে কিছু দেয়, তাই খায়। চিঠি লিখেছে দেশে, মুঙ্গের জেলার কোন এক গ্রামে পৌঁছবে তাদের চিঠি। সেই চিঠি পৌঁছলে তবে আত্মীয় স্বজন সংবাদ পাবে। তার পর তারা টাকাকড়ি পাঠাবে বা কেউ ছুটে আসবে। তখন এরা উদ্ধার পাবে।

জগ্‌মোহনকে নিয়ে পৌঁছলাম সেই চটিতে। অমনি জগ্‌মোহন আমার সমস্ত উপদেশ ভুলে গিয়ে শয়তান দুনিয়ার শয়তানিকে পরাস্ত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। যত বলি, বাপু হে, এখানে অন্তত জড়িও না নিজেকে। সাধু এক জন যখন সর্বনাশ করে গেছে এদের, তখন এরা কিছুতেই আর একটা সাধুকে বরদাস্ত করতে পারবে না। কে কার কথা শোনে! মাইল আষ্টেক চড়াই ভেঙে সব থেকে কাছের ধর্মশালায় উঠে গেল পরদিন সকালেই। ধরে নিয়ে এল দু জন গাড়োয়ালী চৌকিদার। আইন আবার তাদের কণ্ঠস্থ। তারা তৎক্ষণাৎ আইনে যা বলে তাই করলে। যাত্রী কজনকে চটি-ওয়ালাকে আর আমাদের দু জনকে নিয়ে চলল থানায়। সাড়ে তিন দিন সেই মরণাপন্ন লোকগুলোকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে নিয়ে পথ চলার দায়টা আমাদের ঘাড়েই চাপল। থানায় পৌঁছবার পর দেখা গেল, দারোগা সাহেব কর্তব্য কর্ম করার বাসনায় সাত দিনের জন্যে রোঁদে বেরিয়েছেন। অতএব আরও সাত দিন থাক থানায় বসে। হুজুর ফিরে আসবার পরেও আরও দিন তিনেক কাটল, এজাহার নেওয়া জেরা করা এগুলো সারবার জন্যে। অবশেষে যখন নিস্তার পাওয়া গেল, তখন যাত্রীদের আপনজনেরা দেশ থেকে এসে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তাদের খাওয়াতে খাওয়াতে আমাদের ঝুলিতে আর

একটি কপর্দকও নেই। নেই তো নেই, বেপরোয়া জগ্‌মোহন মহা-সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে গুরু সেবা চালিয়ে গাড়োয়াল থেকে বেরিয়ে এল। কোনও মুশকিল নেই।

এই রকমের দুর্ভোগ সয়ে দুটো বছর জগ্‌মোহনের গুরুগিরি চালিয়েছিলাম। তার সঙ্গে যোগ দিতে হবে আরও ছমাস। ছমাস সেবা গ্রহণ করে তবে ওর মাথা মুড়িয়েছিলাম। সমস্ত ইতিহাস বলতে গেলে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত দাঁড়িয়ে যাবে। সে চেষ্টা আর করব না, শুধু ওর অন্তর্ধান পর্বটাই গাই। অন্তর্ধান পর্বেই জগ্‌মোহন নিজের আসল পরিচয়টা দিয়ে গেল কি না। আর সেই পরিচয়ের জের মেটাবার জন্যে একদিন আমায় পৌঁছতে হল ঐ ওধারটায়। যেখানে এখন ঐ বাঁদিক থেকে রাস্তাটা এসে মিশেছে, ঐখানে তখন মস্ত বড় একটা চালার নীচে মস্ত বড় এক কারখানা ছিল গরুর গাড়ির চাকা বানাবার। কত চাকা যে গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে গেছে ওখান থেকে, তার মধ্যে কত চাকা যে গড়াচ্ছে এখনও কত পথে-বিপথে, কে তার হিসেব রাখে। আমিও গড়াচ্ছি, জগ্‌মোহন আমায় পাঠিয়ে-ছিল ঐ কারখানায়। টকটকে পোড়া লোহার বেড় একখানা সেঁটে নিয়েছিলাম নিজের চারিদিকে। তার পর আবার গড়াতে নেমে-ছিলাম। গড়াতে গড়াতে ক্ষয়ে গেছে লোহার বেড়টা তাই ফিরে এসেছি। কিন্তু কারখানাটাই যে উঠে গেছে। এখন কি হবে।

জগ্‌মোহনও ঠিক ঐ প্রশ্নটাই শুধিয়েছিল—"গুরুজী—তখন কি হবে।"

জবাব দিতে পারি নি। কি জবাব দোব ভেবে পাই নি তখন। আজও জানি না, জগ্‌মোহনের প্রশ্নের জবাব কি হতে পারে। সেদিন কিন্তু ভয়ানক চটে উঠেছিলাম। অর্থহীন একটা আক্রোশে ফুঁসিয়ে উঠেছিল বুকের ভেতরটা। এতটুকু সময় ছিল না আর তখন, জগ্‌-মোহনের বিদায় মুহূর্তটি শিয়রে দাঁড়িয়ে ঢুলছিল। চটকা ভাঙলেই অমনি ছুঁয়ে ফেলবে জগ্‌মোহনকে। আমি ছিলাম তার ডান পাশে

বসে, আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়েছিলাম সেই নির্মম মুহূর্তটার পানে। এতটুকু নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছি না তখন। আমার নিঃশ্বাসের শব্দে যদি সেই মুহূর্তে রাক্ষসের তন্দ্রা ছুটে যায়।

জগ্‌মোহন জিরিয়ে জিরিয়ে তার নিজের কাহিনীটা বলে সর্বশেষে জিজ্ঞাসা করলে—"গুরুজী—তখন কি হবে?" প্রশ্নটি করে মহা শান্তিতে চোখ বুজে রইল। বলা তার হয়ে গেছে, খালাস হয়ে গেছে বুকখানা, কাজেই আর অশান্তি কোথায়। সব থেকে আপন জন যে, তার গুরু, তার একমাত্র বন্ধু, মন্ত্র-দাতা মন্ত্রণাদাতা, তার কাছে অকপটে জানিয়ে দিতে পেরেছে নিজের জীবন সমস্যা। আর ভাবনা কি! সমাধান—সমাধানও ঐ মন্ত্রদাতা মন্ত্রণাদাতার ওপর থাক, নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল আমার চেলা। তন্দ্রা ভেঙে সজাগ হয়ে উঠে জগ্‌মোহনের অন্তিম মুহূর্তটা নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়ে পড়েছিল। যাবার বেলায় জগ্‌মোহন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। থাক: যাওয়ার কারসাজিকে সে থোড়াই কেয়ার করে।

সমাধানের সঙ্গে সামনা সামনি একটা সমঝা-সমঝি করবার আশায় উঠে পড়েছিলাম জগ্‌মোহনের পাশ থেকে। তার পর যথা-সময়ে এসে দাঁড়িয়েও ছিলাম চাকাপটিটার সামনে। কিন্তু সমঝা-সমঝিটা কি ঠিক হয়েছিল! গুল-মোর জানে, সবই জানে এই গুল-মোর। এখন না হয় এত বড়টি হয়েছে, এক পায়ে পাথুরে মল পরে দাঁড়িয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। কিন্তু এই তো সেদিনের কথা, দশটা পয়সা দিয়ে ওকে কিনে এনেছিলাম রথের মেলা থেকে। এনে ঠিক এইখানে আধ হাত একটা গর্ত খুঁড়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম। দেড় হাত লম্বা গুল-মোর আধ হাত গর্তে ডুবে বসে গম্ভীর ভাবে মাথা দোলাতে লাগল। দেখে তেড়ে এল ডালপটির যত ছাগল। চাকা-পটির সাধুর গাছ ডালপটির ছাগলে খাবে, তার মানে ভুজাওয়ালারা সমঝেছে কি? অতঃপর আর কিছুই করতে হয় নি আমাকে। আষাঢ় মাস, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, আকাশের আগুন চাকাপটির ডালপটির

টিনের চালে এসে লেগেছে। জ্বলে উঠল সবকটা মানুষের খুন। চেপটা মাথা কুড়ুল হাতে বেরিয়ে পড়ল এরা, ওরা বেরোল বড় বড় খোন্তা আর মাথা সমান উঁচু আগায় লোহা বাঁধানো হামানদিস্তার মুষল ঘাড়ে করে। গুল-মোরের রক্তস্নান হল। রক্তস্নাতা গুল-মোরকে ঘিরে শক্ত বেড়া তৈরী হল সঙ্গে সঙ্গে, গরুর গাড়ির চাকার লোহার বেড় বিশ-ত্রিশখানা খরচা হয়ে গেল। হোক, তা বলে চাকাপটির সাধুর গাছ ডালপটির ছাগলে চিবুতে পারে না।

গুল-মোর বেঁচে গেছে। চাকাপটি ডালপটির চিহ্নমাত্র নেই। আমি কিন্তু আবার ফিরে এসেছি। মানে এখনও একটা ধোঁকায় পড়ে আছি যে। জগ্‌মোহন জিজ্ঞাসা করেছিল—"গুরুজী—তখন কি হবে ?" চেলার সমস্যার সমাধান গুরুকে করতে হয়। নয়তো চেলা গুরু দু-জনেরই মুক্তি নেই। তা সমাধানটা আমি যে ভাবে করেছিলাম, তাতে কি জগ্‌মোহন তৃপ্তি পেয়েছিল !

তৃপ্তি !

ওটি হল এক জাতের জোয়ার ভাঁটার টান। এই টানে পড়ে দুনিয়া সুদ্ধ মানুষ খাবি খেয়ে ম'ল। ভারি মজাদার ব্যাপার একটা ঐ তৃপ্তি। এক জন যখন তৃপ্তি পায়, আর এক জন তখন অতৃপ্তির জ্বালায় জ্বলে মরছে। কার কিসে তৃপ্তি হয়, তাই বা কে বলবে। তৃষ্ণা কি এক জাতের যে তৃপ্তির জাতও এক হবে ! সকলের যাতে তৃপ্তি হয়, এমন কিছু করা কি সম্ভব।

জগ্‌মোহন বুঝতে চাইত না এইটুকুই। ও মনে করত, যখন তখন যেখানে সেখানে যাকে তাকে তৃপ্তি করার শক্তি ওর আছে। যার যে কোনও প্রয়োজনই পড়ুক, জগ্‌মোহনের নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই। তৎক্ষণাৎ ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাধ্যে কুলবে কি কুলবে না, সে চিন্তাটা একটি বারের জন্যেও মনে উদয় হবে না। তার মানে ওর নিজের তৃপ্তিটাই ছিল আসল কথা। রাজ্যের হাঙ্গামা হুজ্জতের ভেতর তলিয়ে না থাকলে ও তৃপ্তি পেত না। এ ব্যাধির চিকিৎসা কি।

ব্যাধিটা কি ভাবে পাকড়াও করেছিল ওকে, সে হদিস পেলাম যখন আমি, তখন রোগ-রুগী দুই নাগালের বাইরে চলে গেল। আচম্বিতে এমন ভাবে ঘটে গেল ব্যাপারটা যে টুঁ শব্দটি করার অবকাশ পেলাম না। করবই বা কি তখন, এক গলা জলে দাঁড়িয়ে আছি। জল থেকে উঠে তো বাধা দোব। জল থেকে উঠতে উঠতেই লোপাট হয়ে গেল জগ্‌মোহন। হাঁ করে মোটর গাড়িখানার পেছন দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একসঙ্গে জলে নেমেছিলাম দু জনে। প্রচণ্ড ভিড়, অর্ধোদয় যোগ, অর্ধ লক্ষ মানুষ সমুপস্থিত হয়েছে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করে পাপের প্রলেপ ধুয়ে ফেলবার আশায়। ব্যাপার দেখে জগ্‌মোহনকে বললাম—"চল হে, সঙ্গমে স্নান করে কাজ নেই। বিশেষ এমন আর কি পাপ করেছি আমরা যে একেবারে সঙ্গমে না ডুবলে নিস্তার নেই। একটা নিরিবিলি জায়গা দেখ, গঙ্গাতেই বা যমুনাতেই হোক ডুব দিতে পারলেই হল। চিত্তশুদ্ধি নিয়ে কথা। কি দরকার গুঁতোগুঁতি করে।"

জগ্‌মোহনেরও তাই মত। পাপ-পুণ্যের প্যাঁচ নিয়ে মাথা ঘামাত না মোটে। এক পাক ঘুরে এসে বললে, জায়গা একটা আছে খানিকটা দূরে। একখানা মাত্র মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। বড় ঘরের বড় গাড়ি, সাধারণের সঙ্গে মিশতে পারবে না এমন ধরনের মানুষরা স্নান করতে এসেছে। সাধারণ মানুষ সেখানে একটিও নেই।

চললাম সেখানেই। গঙ্গার ধার দিয়ে অনেকটা হেঁটে পৌঁছলাম। সত্যিই কেউ নেই, অত দূরে যাবেই বা কেন লোকে। মোটরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দিকে নজর দেবার অবকাশ মিলল না। গ্রহণ ছেড়ে গেল। সঙ্গমে কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি জলে নেমে পড়লাম।

গোটাকতক ডুব দিয়ে সদ্য রাহুমুক্ত সূর্যদেবকে স্মরণ করে এক আঁজলা জল হাতে তুলেছি, পেছন থেকে একটা গোলমাল যেন কানে এল। তৎক্ষণাৎ তো আর পেছন ফিরতে পারি না। তিন আঁজলা

জল সূর্যদেবকে সমর্পণ করে প্রণাম করলাম। তার পর চোখ চেয়ে দেখি, পাশে জগ্‌মোহন নেই। মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম ডাঙার ওপর। চক্ষু স্থির হয়ে গেল একেবারে। জনা চারেক লোক জগ্‌মোহনকে চেংদোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে গাড়িখানার দিকে ছুটছে।

কি হল! হল কি! আরে কেয়া হুয়া! আরে হুয়া কেয়া?

পড়ি তো মরি করে উঠে এলাম ডাঙ্গায়। দুই মূর্তি পথ আগলে দাঁড়াল। যেমন তাদের গোঁফ, তেমনি পাগড়ি, গলার আওয়াজও আসল বাজখাঁ ঘরানার। সেই গলায় উভয়ে একযোগে একস্বরে এক-তালে হাস্যরাগ সাধতে শুরু করলে।

পিত্তি জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। পিত্তি আবার এমন পদার্থ যা জ্বলে উঠলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। হঠাৎ লাগালাম এক গুঁতো এক-জনের ভুঁড়িতে। রসিকতা মনে করে ওটা গ্রাহ্যও করল না সে। হাসির দমক আরও বেড়ে গেল। অগত্যা তাদের পাশ কাটিয়ে ছুটলাম। যেদিকে গাড়িটা গেল ছুটতে লাগলাম সেদিকে। তারাও ছুটতে লাগল পেছন পেছন। শেষ পর্যন্ত একটা চৌমাথায় পৌঁছে থামতে হল। কোন্ দিকে যাওয়া যায়।

বাজখাঁর বংশধর দু জনের এক জন পেছন থেকে বলে উঠল—"আরে বাবা, কেন ঝুটমুট হাল্লাক হচ্ছ। রাণী মাইজী হুকুম দিয়ে গেছেন তোমাকে টাঙ্গায় উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। দাঁড়াও, একটা টাঙ্গা বোলাই।"

রাণী মাইজী! তিনি আবার কে! হঠাৎ টাঙ্গায় উঠিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম দেওয়ার অর্থ!

যাক, তখনকার মত চেপে গেলাম। দরকার কি ঘাঁটিয়ে। পৌঁছই তো আগে জগ্‌মোহনের কাছে, তখন বোঝা যাবে কোথাকার রাণী তিনি। কোন্ এখ্‌তিয়ার আছে তাঁর ঘাট থেকে মানুষ ধরে আনার, তাও জানা যাবে।

জানতে বুঝতে খুব বেশী বিলম্ব হল না। টাঙ্গা গিয়ে ঢুকল মস্ত

এক গেটের মধ্যে। শুরু হয়ে গেল যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন। কম কথা তো নয়, সাক্ষাৎ জামাই বাবাজীর সাক্ষাৎ গুরুদেব। কার সাধ্য গুরুদেবকে অসম্মান করে!

সত্যি বলছি, বেশ একটু তেতে উঠেছিলাম। এত বড় একটা ঘরের জামাইকে চেলা হিসেবে পেয়েছি, চেলা আমার রুটি বানিয়েছে, কাপড় ধুয়েছে, মোট বয়েছে, চেলার উচিত কর্ম সবই করেছে, এ সব কি চাট্টিখানি কথা। প্রথম থেকেই কিন্তু একটু খটকা লেগেছিল। ওর দিলদরিয়া মেজাজ বেপরোয়া চালচলন সহজ সভ্য আচার ব্যবহার এটুকু পরিচয় দিচ্ছিল যে নিঘিন্নে ঔদরিক উৎপীড়ন অসহ্য হওয়ায় যারা ঔদাসীন্য অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, ও সে শ্রেণীর নয়। পথের ধূলায় কুড়িয়ে পাওয়া পথের সাথীর পরিচয় পথের ধূলায় লেখা থাকে। তার আগের পরিচয় জানতে চাওয়া গুরুতর গোস্তাকি। তাই ওর পথের পরিচয়কেই আসল পরিচয় ধরে নিয়ে আড়াইটা বছর পথে পথে কাটিয়ে দিয়েছি। অকস্মাৎ আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাত স্বর্গে উঠে গেল, গোভাগাড়ের গুলাল রাজার তুলালের কপাল স্পর্শ করলে। এবং আমি হলাম গুরুদেব, রাজার তুলালের গুরুদেব। এততেও যদি না তাতে রক্ত, তা হলে তেমন রক্ত ঐ ঘাটের মড়ার শিরার মধ্যেই জমাট বেঁধে আছে।

গুরুতর ওজনের গুরুতর পদাধিকারী তু-এক জন গুরুগম্ভীর চালে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় কত বছর আগে জামাতা বাবাজীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বললাম। প্রায় মিলে গেল। ঠিক তার কিছু-দিন আগেই উনি নিরুদ্দেশ হন। বললাম—“প্রারব্ধ কর্মফল আর কি। গত জন্মে মহাতপস্বী ছিলেন। এ জন্মে কিছু দিন প্রব্রজ্যা নিয়ে জ্ঞান লাভ করলেন। এবার সত্যিকারের সংসার ধর্ম পালন করবেন। ওটুকু জ্ঞান ওঁর প্রয়োজন ছিল।” তার পর কয়েকটা জ্বলন্ত উদাহরণ দিয়ে দিলাম। কি ভাবে ওঁদের জামাতা বাবাজী পরের জন্যে বারবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন, তা শুনিয়ে দিলাম। সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা চলে গেলেন। আমার চেলাটি এসে ঘরে ঢুকল।

চমকে উঠলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। যে মুখে কোনও দিন কালো ছায়া দেখি নি, দিনের পর দিন না খাওয়া না ঘুম, তবু যে মুখের বিচিত্র হাসিটুকু বজায় থেকেছে, সে মুখের আলো নিভে গেছে। যেন সেই জগ্‌মোহন নয়, যেন অন্য কেউ। গেরুয়া কাপড়ের টুকরো দু-টোও নেই অঙ্গে, মহামূল্য গরদ চড়েছে। ইতিমধ্যেই গলায় উঠেছে এক গোছা সোনার বিছে হার, দু হাতের আঙ্গুলে স্থান পেয়েছে গোটা দুয়েক পাথর বসানো আংটি। কড়া আতরের গন্ধে দম আটকে এল আমার। চেলা গোড় স্পর্শ করে একটু তফাতে বসে পড়ল।

ওকে একটু চাঙ্গা করা দরকার মনে করলাম। গলায় যথেষ্ট গাঢ় দরদ জমিয়ে বললাম—"তার পর কানাইয়ালাল! মন খারাপ করছিস কেন বেটা? অ্যাঁ? আরে সংসার-ধর্মটাও একটা ধর্ম, খুব কঠিন ধর্ম। সাধুগিরি করতে নামলে দায় থাকে না দায়িত্ব থাকে না। যেমন এই তালগাছ আর বটগাছ, বুঝলি না। তালগাছের তলায় কেউ আশ্রয় পায়? বটগাছ কত জীবকে আশ্রয় দেয়! সংসারী ঐ বটগাছ আর সাধু হল তালগাছ। বুঝলি না ব্যাপারটা? অ্যাঁ? মন খারাপ করার আছে কি এতে—অ্যাঁ?"

আরও বিস্তর সব দামী কথা শোনালাম চেলাকে। একটানা বকতে বকতে হঠাৎ খেয়াল হল, চেলা সেই যে মুখ নীচু করে বসেছে, একটি-বারের জন্যে মুখ তুললে না। থামতে বাধ্য হলাম। জগ্‌মোহন মুখ তুলে তাকাল আমার পানে। তার পর ফিসফিস করে বললে—"কিন্তু মহারাজ, সত্যি তো এরা আমার আপন জন নয়।"

বাক্‌রোধ হয়ে গেল আমার। গরদের কাপড় চাদর পরে সোনার গয়না গায়ে দিয়ে কে ও বসে আছে সামনে! কার কাছে এতক্ষণ ধরে আমি বাক্‌চাতুরি ফলাচ্ছিলাম! কি করছিলাম এতক্ষণ!

সেই রকম চাপা স্বরে সেই রকম হিমশীতল বাক্য আরও কয়েকটি বার হল ওর মুখ থেকে—"যারা আমার আপনজন, তাদের কাছে যে মুখ দেখাবার উপায় নেই। তাই তো এভাবে মরে বেঁচে রয়েছি।"

কি যে হল আমার, বলতে পারব না। কানে মুখ ঠেকিয়ে হঠাৎ খুব জোরে ফুক দিলে যেমন তালা লেগে যায় কানে, তেমনি ধরনের একটা কিছু হল যেন। বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে জগ্‌মোহন বলতে লাগল—"আহা—বুড়ীটার আকুলিবিকুলি দেখলে মড়াও টিকে থাকতে পারে না। ঐ বুড়ীটাকে কাঁদবার জন্যে রেখে যে চলে গেছে, সে বোধ হয় মড়ারও বাড়া। কি করে এখন ঐ বুড়ীটাকে মেরে আমি যাব?"

প্রচুর জোরজবরদস্তি করে গলা দিয়ে স্বর বার করলাম। বললাম—"কিন্তু জগ্‌মোহন, বিপদ ঘটবে যে। শুনলাম, আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই এদের সঙ্গে দ্বারভাঙ্গায় যেতে হবে। সেখানে পৌঁছে কি করবে? বুড়ী ভুল করেছে, বুড়ীর সঙ্গে এসেছে যারা, তারাও ভুল করেছে। কিন্তু বুড়ীর নাতনীর সামনে দাঁড়াতে হবে তো তোমায়। তখন?"

জগ্‌মোহন খুবই সহজ ভাবে জবাব দিলে—"তখনই ছাড়া পাব। আর কেউ চিনতে পারুক না পারুক, সে নিশ্চয়ই পরামর্শ দেবে, কি করলে বুড়ীও বাঁচে, আমিও বাঁচি।"

খুব জোর দিয়ে বললাম—"তা হয় না জগ্‌মোহন। কিছুতেই অতটা এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। এখানেই ফয়সালা করে চল আমরা পালাই। বুড়ী গোল্লায় যাক্‌, আমাদের কি?"

ডুকরে কেঁদে উঠল জগ্‌মোহন। উঠে এসে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে বলল—"না না মহারাজ। সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখানেই এখুনি মরবে তা হলে বুড়ী। ঠিক ঐ রকম আমার ঠাকুমা। সেও হয়তো আজ ঐ রকম কাঁদছে। কিছুতে আমি ঠাকুমাকে মারতে পারব না।"

এর ওপর আর কথা চলে না।

কথা চলবে কেমন করে, ওধারে গজেন্দ্রগমন যোগ যে কপালে নাচছে।

হাতীর ওপর চড়ার সৌভাগ্য পর্যন্ত ঘটে গেল। মস্ত বড় ঘরের

জামাইকে চেলা করতে পারলে কোন্ সৌভাগ্যটা না ঘটতে পারে! দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছে বুঝতে পারলাম, সৌভাগ্যের গতরখানা কি পরিমাণ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গণ্ডা গণ্ডা হাতী উপস্থিত হয়েছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। তার মানে—যেতে হবে এমন স্থানে যেখানে রেল গাড়ির ঘড়ঘড়ানি পৌঁছতে পারে না।

হাতীতে চড়বার পূর্ব মুহূর্তে একবার দেখা করার চেষ্টা করলাম জগ্‌মোহনের সঙ্গে। সম্ভব হল না। দিদিশাশুড়ী নিমেষের জন্যেও নাতজামাইকে নজরের আড়ালে যেতে দেবে না। হাওদাওয়ালা সবচেয়ে বড় একটা হাতী আগেই বুড়ীকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পরে হাওদার ওপর থেকে দু হাত জোড় করে আমায় প্রণাম জানালে জগ্‌মোহন। ডান হাত তুলে অভয় দিলাম। অর্থাৎ ঠিক আছি, ঠিক চলেছি তোমার সঙ্গে। জাহান্নমের জঠরেও তোমার সঙ্গী থাকব। কুছ্ পরোয়া নেই।

হায় রে—তখনও যদি বুঝতে পারতাম—কোন্ জাতের পৈশাচিক পরোয়ানার আকর্ষণে কোথায় চলেছি আমরা—তা হলে বোধ হয় অতটা বেপরোয়া হতে পারতাম না।

সময়ও বোধ হয় ছিল না তখন ফেরবার। মানে—সুযোগ তখন অনেক পেছনে পড়ে আছে। প্রয়াগ থেকে যাত্রা করার সময়েই বিষম বিতৃষ্ণায় আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে ছিল সুযোগ। সেধে যারা যমের গ্রাসে সেঁদোতে চলল, তাদের রক্ষা করার সাধ্য কার আছে।

যাক্, শেষ পর্যন্ত হস্তী-পৃষ্ঠে সমারূঢ় হলাম। চটের ভেতর রাশীকৃত খড় পুরে এক গদি বানিয়ে হাতীর পিঠে মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা হল। তার ওপর পড়ল লোমের কম্বল। তার ওপর বসে থাকতে হবে। তকলিফ কিচ্ছু নেই। যে কাছিটা জড়ানো রয়েছে হাতীর সঙ্গে, যাতে আটকে আছে খড়ের গদিখানা, সেইটে এক হাতে ধরলেই হল। কষকষে করে বাঁধা ঐ কাছির তলায় আঙ্গুল যাবে কেমন করে? ঘাবড়াবেন না, হাতী চলতে শুরু করলেই দেখবেন, রশিটা কত ঢিলে হয়ে যাবে।

বলতে বলতে হাতী উঠে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যেত গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ হওয়া। পেছনে যিনি ছিলেন তিনি তাঁর দু হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তখন নিজের হাত দু খানা সজাগ হয়ে উঠেছে। প্রাণপণে খামচে ধরলাম খড়ের গদির চট। হাতী চলতে শুরু করলে।

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, দেবরাজ ঐরাবতে চড়ে বহু লড়াই করেছেন। ঐরাবতের ওপর বসেই বজ্র নিক্ষেপ করে এন্তার অসুর বধ করেছেন। বাহাদুরি দিতে হয় তাঁর হাতের টিপকে! চলন্ত হাতীর পিঠে থেকে তাক করে ছুঁড়ে মারা—হাঁ—সত্যিই এটি দেবদুর্লভ শক্তি। মনে পড়ে গেল অর্জুনের কথা। ছোকরা বয়সেই লক্ষ্যভেদ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বাহাদুরি কিছুই নেই, কেমন বাপের বেটা ছিলেন, সেটা দেখতে হবে তো।

হাতী তার পর চলল।

মুশকিল হচ্ছে, পিঠের ওপর কিছু আছে, তা মোটে টেরই পেল না। নিতান্ত নির্বিচারে খানা-খন্দ পার হয়ে, শুঁড়ে জড়িয়ে গাছপালা উপড়ে জঠর গহ্বরে নিক্ষেপ করতে করতে যেখান দিয়ে খুশি চলল। ডাঙ্গশ হাতে যে লোকটা বসেছিল তার কাঁধের ওপর সে জুড়ে দিলে গান। কোথায় নাকি কবে কোন ব্রিজ্‌বিহারী লালার জন্যে এক খুবসুরতিয়া গাগরিয়া ভরতে যেতে পারত না, না পারার ফলে নিজের বাঁ কানটা বাঁ হাতে চেপে ধরে পরিত্রাহি চিৎকার করত, হঠাৎ সেই খুবসুরতিয়ার প্রাণের দুঃখটা ডাঙ্গশধারীর বুকের মধ্যে উদয় হল। হাতীটা বোধ হয় মনে করল, তার কাঁধের ওপর বুনো শুয়োর জবাই করা হচ্ছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করছে শুয়োর একটা ঠিক মুণ্ডটার পেছনে পড়ে, কি বীভৎস কাণ্ড! হাতী তখন তার আসল চলন চলতে শুরু করলে।

হাতীবাগানের মোড়ে সের দুয়েক গয়না পরা মিত্তির গিন্নীকে ট্রাম লাইন পার হতে দেখে যাঁরা গজগামিনী কথাটা ব্যবহার করে থাকেন,

তাঁরা হাতীবাগানের হাতী ছাড়া অন্য জাতের হাতীর পরিচয় পান না। পেলে অবশ্যই গজগমন বাক্যটাকে হেলাফেলা করে ব্যবহার করতেন না। দারভাঙ্গার মাঠে ট্রাম লাইনও পাতা নেই। কোনও কালে বঙ্গের দোরগোড়ায় নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্রকাণ্ড ঘটেছিল। মাটি থেকে রক্তের ছোপ এখনও ঘোচে নি। বঙ্গের দরজা যারা পাহারা দিয়েছিল, তারা কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছিল, তার প্রমাণও সেই রক্তমাখা মাটিতেই রয়েছে। ধরিত্রীর অঙ্গ উলটে পালটে তছনছ করে এহেন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে তারা যে স্বয়ং বিধাতা পুরুষও সেখানে ট্রাম লাইন পাতবার কল্পনা করতে পারবেন না। সুতরাং হাতীবাগানের গজগমনের চিন্তা থাক।

আমাদের গজটি গমন এবং ভক্ষণ দুটো কাজই এক সঙ্গে চালাতে লাগল বলে ব্যাপারটা বিশেষ বাঁকা পথ ধরলে। পছন্দসই খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেলেই নিঃসঙ্কোচে ধাওয়া করতে লাগল সেখানে। প্রাণ যায় আর কি! অবশেষে বলতে বাধ্য হলাম, আমায় নামিয়ে দাও, হেঁটে যাব। গরীবের ঘোড়ারোগই সয় না, ভিখিরীর হাতীরোগ বরদাস্ত হবে কেন। শুনে আমার পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন যিনি, তিনি একটি হাঁকার মারলেন। খুবসুরতিয়ার ধ্যানে নিমগ্ন ডাঙ্গশওয়ালার হুঁশ হল। অনুচ্চার্য সম্বোধনে সম্মানিত করতে শুরু করল সে হাতীটাকে। তখন বুঝলাম, মূলেই গলদ রয়ে গেছে। হাতী বলে যাকে মনে করেছিলাম এতক্ষণ, আসলে সে একটি সর্বসুলক্ষণা হস্তীললনা। অতিশয় কৃষ্টি-সম্পন্না এবং খানদানী শিষ্টাচার পরায়ণা তাও বুঝতে বাকী রইল না। অশিষ্ট অশালীন সম্বোধন কানে যাওয়া মাত্রই নোলা সংবরণ করে সত্যিকারের পথের ওপর উঠে এল। লাইট হাউস থেকে বেরিয়ে শেষ কাজু বাদাম কটা মুখে পুরে খালি ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেমন শিষ্ট ভাবে হাঁটে অনেকে, তেমনি আর কি। মোটে মুখ নড়ছে না, কে বলবে তখন যে ইনিই ঝাড়া দু ঘণ্টা ধরে অবিরাম চর্বণ করেছেন এবং বকতে বকতে পাশের লোকটির মাথা ধরিয়ে দিয়েছেন।

চর্বণ, বকবক করণ এবং সিনেমা দর্শন, তিনটে কাজ একসঙ্গে চালানো যেমন মনুষ্যনন্দিনীর পক্ষে সঙ্গত নয়, তেমনি গমন ভক্ষণ আর সঙ্গীতশ্রবণ এই তিনটে কর্মও কোনও গজবালার পক্ষে একসঙ্গে চালানো সমীচীন হয় না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আশপাশে আরও মানুষ রয়েছে। সেই গজদুহিতার আশপাশে নয়, একেবারে পিঠের ওপরেই ছিলাম আমরা। কাজেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। অতঃপর মারাত্মক কিছু ঘটবার সম্ভাবনা রইল না। শুধু পেটের নাড়ীভুঁড়িগুলো অবিশ্রান্ত দোলা লাগার ফলে বুকের ভেতর দিয়ে গলার মধ্যে উঠে এল। পেছনে যিনি বসেছিলেন, তাঁকে জানালাম বিপদটা। তিনি তৎক্ষণাৎ এক মাত্রা ডবল-ডোজ খইনি প্রিস্‌ক্রাইব করলেন। যাক, আর কথা বাড়ালাম না, কি বলতে কি বেরিয়ে পড়বে মুখ ফসকে, দরকার কি!

কথা কিন্তু এবার শুরু হল।

এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি সংকেত ধরতে পারলাম আমি। আমার পেছনে যিনি বসেছিলেন, তিনি আমায় টপকে আলাপ শুরু করলেন ডাঙ্গশধারীর সঙ্গে। দ্বারবঙ্গের দেহাতী বাত, মনোগত ভাব প্রকাশ করার অতি উপাদেয় উপাদান। দাঁতের সঙ্গে জিভ এবং জিভের সঙ্গে তালুর সম্পর্ক বর্জিত সেই উচ্চারণ শুধু উপজিহ্বার সাহায্যেই সমাপন করা হয়। কারণ মুখের সম্মুখভাগটা খইনিজাত থুথুর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। সংক্ষেপে বলতে হলে বলতে হয়, ওই বাত জলজ। মুখে একমুখ জল ভরে কথা বলার চেষ্টা করলেই দ্বারবঙ্গের দেহাতীভাষা হুবহু বেরিয়ে আসবে।

সেই জলে ডোবা কথাবার্তা শুনে অগাধ জলে পড়লাম। শুনলাম, বহুত মজা একটা ঘটবে। যে নাতনীটির জন্যে নাতজামাইটিকে এত আদর যত্ন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি নাকি এমনই খাণ্ডারনী যে হাতে পেলে নাতজামাই বাবাজীর নাক কেটে নেবেন। তা ছাড়া

কোন্ আক্কেলে যে লোকটা আবার ফিরে এল, সেও এক তাজ্জব বাত মানে—শরম বলতে কিচ্ছু নেই আর কি। বিলকুল মালুম আছে, তবু ফিরে যাচ্ছে। বেধড়ক বেঅকুফ আর কাকে বলে!

বেঅকুফ যে কত বড় নাতজামাইটি, সে সম্বন্ধে আমারও টনটনে জ্ঞান ছিল। কাজেই মতান্তর হওয়ার ডর ছিল না। নির্ভয়ে তখন তাদের আলাপে যোগ দিলাম। ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম যে আমিও মজা দেখতে চলেছি। চেলা বানিয়েছিলাম লোকটাকে, কিন্তু তখনই জানতাম যে পহেলা নম্বর একটি আহাম্মক। আর সত্যি কথা বলতে কি, সীয়ারামের কৃপা পাওয়া তো যার তার ভাগ্যে ঘটে না! তুলসী-দাসজী নিজেই বলে গেছেন—সচ্ কহো আওর প্রেম রাখ ছোড় দেও পরধন কি আশা, ইথে রাম যব নেহি মিলে তব জামীন তুলসীদাসা।

মোক্ষম মার যাকে বলে। রামঅস্ত্রে ঘায়েল হয় না কে? তার ওপর আবার আসল তুলসীদাসী দোঁহা। একটা মোক্ষম চমক খেলে হস্তীনন্দিনী। পিঠের ওপর বসে দুটি রামভক্ত বিকট চিৎকার করে উঠল—জয় সীয়ারাম। আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিলাম, টালটা সামলে নিয়ে ছোট্ট কলকেটি ঝুলি থেকে বার করলাম। তার পর খুবই নির্লিপ্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, হাতীর ওপর বসে পার্বতীপতির ভোগ চড়ানো চলে কি না। দু-জনেই এক বাক্যে বলে উঠল—আলবত। এবং তৎক্ষণাৎ ডাঙ্গশধারী গদি থেকে খড় বার করে নিয়ে দু হাতের তালুতে ঘষে নুটি পাকাতে লেগে গেল। তার পর আর কষ্ট করে জলজ বাত থেকে সংকেত ধরবার চেষ্টা করতে হল না আমায়। পার্বতীপতির প্রসাদ গ্রহণ করে ওদের মন মুখ হৃদয় সমস্তই যৎপরোনাস্তি নির্বিকল্প নির্বিশঙ্ক হয়ে উঠল। নির্বিঘ্নে তখন বড়া ঘরকা কিচ্ছাটুকু শুনে নিলাম।

অতি পুরাতন নাটকের অতি আধুনিক রূপান্তর গ্রহণ। সোজা সহজ বিষয়বস্তু। বড়লোকের নাতনী বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরা-ধিকারিণী। গরীবের ঘর থেকে একটা ছেলেকে এনে তার সঙ্গে

নাতনীর বিয়ে দেওয়া হল। তার পর ছেলেটাকে শহরে পাঠানো হল লেখাপড়া শেখবার জন্যে। ওদিকের প্রথা হল, কনের বয়স বরের চেয়ে সামান্য কম হবে, অনেক ক্ষেত্রে দু-এক বছর বেশীও হয়ে পড়ে। কাজেই নাতজামাই যখন পড়তে গেল, নাতনী তখন দস্তুরমত লায়েক হয়ে পড়েছে। ঘরেই ছিল দূর সম্পর্কের এক ভাই। সুযোগটা সে লুফে নিলে। অত বড় সম্পত্তি বেহাত হয়ে না যায়, এই ভয়ে তার বাপ মা তলে তলে কলকাঠি নাড়তে লাগল। নাতজামাই বেচারার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ল তখন। একবার নাতজামাই শহর থেকে ফিরেছে, শুয়েছে বউ নিয়ে রাত্রে। বউ তাকে এমন মার দিল যে পরদিন সকালে কেউ আর তাকে দেখতে পেল না। অনেকে নাকি জানতে পেরেছিল যে নাতনীর সেই দূর সম্পর্কের ভাইটি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। যাক্ গে, বড় ঘরের বড় কথা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সব জেনে শুনে আহাম্মক লোকটা ফিরে যাচ্ছে কি করে! ইজ্জত বলতে কি কিছুই নেই ওর! হায় সীয়ারাম!

সীয়ারাম সীয়ারাম বলে তখনই ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করলাম আমরা। জীবের দুঃখ-দুর্দশার কি অন্ত আছে! কাজেই মর্মাহত হয়ে আর এক কলকে ভোগ পার্বতীপতিকে উৎসর্গ করার বায়নায় আবার তোড়জোড় শুরু করে দিলাম। এখন পবননন্দন রামভক্ত হনুমানজীই একমাত্র ভরসা। তুলসীদাসজী তো বলেই গিয়েছেন—থাক। কি বলে গিয়েছেন তা আর বলে কি হবে। তার চেয়ে জয় সীয়াপতি রামচন্দ্রজীকা জয়।

কড়াক্কড়-পন্থী সাধু কখনও গৃহস্থের চালের তলায়-মাথা দেন না। হাতী থেকে নেমে সেই কথাই ঘোষণা করলাম। ধুনি লাগাবার স্থান নির্বাচন করলাম গ্রামের বাইরে এক গাছতলায়। বললাম—“থাকব তিন রাত্রি। তোমরা যখন বলছ, আমি থাকলে শিষ্য পালাবে না, তখন তিন রাত্রি থাকা ঠিক করেছি—। পালাবে কেন? এইটেই যদি ওর বাড়ি হয়, ওর স্ত্রী যদি এখানেই থাকে, তা হলে কেন পালাবে?

কিন্তু ওর স্ত্রী আগে ওকে দেখুক, সে আগে মানুক যে আমার ঐ শিষ্যটিই তার স্বামী, তবে না কথা। শিষ্য তো এখনও সমানে বলে চলেছে যে তোমরা ওর কেউ নও, ও তোমাদের কস্মিন্‌কালেও দেখে নি। তোমাদের কাউকে ও চেনেও না জানেও না। তোমরা বলছ, একদম উলটো কথা। দেখি আগে, তোমাদের সেই মেয়ে কি বলে। তার পর থাকা না থাকার বিষয় চিন্তা করা যাবে। এখন এই গ্রামের বাইরেই ধুনি লাগাব। যাও, কাঠের ব্যবস্থা কর গে।"

সানন্দে সেই ব্যবস্থা করে দিলে তারা। বলে গেল, মেয়ে আড়াল থেকে দেখে চিনে ফেলেছে। সন্ধ্যা হতে তো আর বেশী বিলম্ব নেই। রাত্রেই ওদের ভেতর বোঝাপাড়া হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার আগে জগ্‌মোহন এক বার দেখা করতে এল। প্রচুর পান চিবুচ্ছে। জনা আষ্টেক ওর সমবয়সী মানুষ ওকে ঘিরে নিয়ে এল। কোনও কথাবার্তাই হল না। শুধু ওর মাথার ওপর ডান হাতখানা একটু সময় চেপে রাখলাম। ওরা চলে গেল।

এল ঢোল এল করতাল, তার পর প্রবল বিক্রমে খচমচ শুরু হয়ে গেল। ভক্ত কোন্ দেশে না আছে!

রাত বাড়তে লাগল। বিকট চিৎকার আর খচমচ চলতে লাগল আমার সামনে। তাতেও কিন্তু একটুও অন্যমনস্ক হতে পারলাম না। গ্রাম থেকে যে পথটা বেরিয়ে এসেছে, বার বার সেই পথের দিকে তাকাতে লাগলাম। শুধু জোনাকি জ্বলছে। মিসমিসে কালো ভেল-ভেটের যবনিকা পড়ে আছে কয়েক হাত সামনে, আর যবনিকা-খানির গায়ে অসংখ্য আগুনের ফুলকি চিক্‌মিক্ করছে।

কি ঘটছে এখন ঐ যবনিকার অন্তরালে! গ্রামের মধ্যে মোটে ঢুকলামই না, কোথায় কত দূরে সেই বাড়ি, বাড়িখানা কেমন, সব দেখে আসা উচিত ছিল। যদি কোনও বিপদ-আপদ ঘটে জগ্‌-মোহনের! যদি সে আর ফিরেই না আসে! যদি—!

শেষ যদিটায় থমকে গেলাম। অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব।

কিছুতেই তা করবে না জগ্‌মোহন, কোনও মতেই কোনও প্রলোভন তাকে বাঁধতে পারবে না। সে যখন নিজেই সব থেকে ভাল করে জানে যে ঐ মেয়ে তার কেউ নয়, তখন কিছুতেই তার অঙ্গ স্পর্শ করবে না।

আবার একটা কিন্তু! ভ্যালা আপদ হল তো দেখছি! জগ্‌মোহন সম্বন্ধে কোনও যদি কোনও কিন্তু খাটবে না, খাটতে পারে না। রূপ-যৌবন অর্থ-সম্পত্তি সুখ-শান্তি—ছোঃ—সব ছাইপাঁকা জঞ্জাল। জগ্‌-মোহন কষ্টি পাথরে ঘষা আগুনে পোড়ানো খাঁটী সোনা। খাঁটী সোনায় কলঙ্ক লাগতে পারে কখনও।

তা ছাড়া সেই মেয়েই যে রেহাই পেতে চায় তার আসল স্বামীর হাত থেকে। জগ্‌মোহন যখন বলবে যে বুড়ীটা পাছে মরে, সেই জন্যেই সে এসেছে, তখন সেই মেয়েও জগ্‌মোহনের সঙ্গে শত্রুতা করবে না। সহজেই নিস্পত্তি হয়ে যাবে মামলার। কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন! এতটা দেরি হবার মানে কি! নাতনীর মুখ থেকে আসল কথাটা শুনে বুড়ীটাই শেষ পর্যন্ত আবার দাঁত ছরকুটে পড়ল নাকি।

হঠাৎ ঝক্‌মক্ ঝাঁই আর গাহকদের স্বর এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল আকাশ ছোঁয়ার আশায়। তার পর ঝপ্‌ করে পড়ল থেমে। বিশাল একটা অগ্নিকুণ্ড হু হু করে জ্বলে উঠেই টপ্‌ করে একেবারে নিভে গেল যেন। জুড়োল জায়গাটা চোখ বুজে বসেছিলাম। মেললাম চোখ দুটো, এবার ভক্তদের বিদেয় দেওয়া দরকার।

কিন্তু ও কি! কে ও! কে ওভাবে অন্ধকারে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কি হল! হল কি ওর!

চিৎকার করে উঠলাম—“এই, কে ওখানে? কি হয়েছে তোমার?

সাড়া নেই। ঘাড়টা যেন ভেঙে গেছে, মুখখানা নুয়ে পড়েছে বুকের ওপর। এক ভাবে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভক্তরা লাফিয়ে উঠেছে ততক্ষণে। একটি মাত্র কেরোসিনের আলো

জ্বলছিল সকলের মাঝখানে। সেটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল কয়েকজন। তার পর তাকে দু-দিক থেকে ধরে নিয়ে এল আমার সামনে।

উঠে দাঁড়াব কি! তখন আমার কোমর পর্যন্ত বসে গেছে মাটির মধ্যে। বুকফাটা চিৎকারই শুধু একটা করতে পেরেছিলাম—"জগ্‌মোহন!"

জগ্‌মোহন চেষ্টা করে মুখটা একবার তুলল। ঠোঁটের ফাঁকে সাদা গাঁজলা খানিকটা দেখতে পেলাম। অস্পষ্ট ভাবে বললে—"জহর—হাম পি লিয়া।"

সেইখানে সেই প্রথম রাত আর শেষ রাতও সেইটা। সেই কাল-রাত্রিতে গ্রামের প্রায় সব কজন মানুষ জেগে বসে রইল আমাদের চারিদিকে। বড়লোকদের বৃদ্ধ কর্মচারি দু-চার জনও বসে রইলেন। করবার কিছুই ছিল না। ডাক্তার নেই বদ্যি নেই পাঁচ-সাত ক্রোশের মধ্যে, তখন আর সময়ও ছিল না। শুধু জল, জগ্‌মোহনের মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে ওর মুখে জল দিতে লাগলাম। শেষে নিজে ইচ্ছে করে এক লোটা জল খেয়ে ফেললে সে। তার পর হুড়হুড় করে বমি করলে খানিক। করে আরও নেতিয়ে পড়ল। হারামজাদী শয়তানী আশা ছিনালী জুড়ে দিলে আমার বুকের মধ্যে, বোধ হয় সামলে উঠল, বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পেল। ওর কানের ওপর মুখ চেপে ধরে বললাম—"শিবনাম নাও জগ্‌মোহন, মা ভবানীকে বুকের মধ্যে দেখবার চেষ্টা কর। ভবানী মা তোমায় রক্ষা করবেন। মা তোমায় ফিরিয়ে দেবেন আমাকে! পথের ধুলোয় পড়ে মরবার জন্যে জন্মেছি আমরা। খোলা আকাশের নীচে ধরিত্রীর বুকের ওপর মহাশান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। কিন্তু এ কি হচ্ছে। জগ্‌মোহন এ ভাবে তোমার মরা চলবে না। কেন তুমি মরতে যাবে এই আগঙ্গার দেশে? বিষ কি করবে তোমার? তুমি মা ভবানীর সন্তান, তুমি মায়ের চরণামৃত পান করেছ জগ্‌মোহন, বিষে তোমার কি করতে পারে? মা ভবানীর পায়ের

তলায় আশ্রয় নাও, মায়ের পায়ের তলায় আশ্রয় পেয়ে স্বয়ং নীলকণ্ঠ রক্ষা পেয়েছে, বিষে তাঁর কি করতে পেরেছে ?"

যতক্ষণ দমে কুলিয়েছিল, যা মনে এসেছিল, বলেছিলাম। কি বলছি কি বলছি না, কিছুই খেয়াল ছিল না। হুঁশ হল, যখন জগ্‌মোহন কথা বলতে শুরু করলে। প্রতিটি মানুষ নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগল। খুব ক্ষীণ কণ্ঠে জিরিয়ে জিরিয়ে জগ্‌মোহন বলতে লাগল—

গুরুজী, কে মা ভবানী ? নিজের স্বামীকে বিষ খাইয়েছে, তাতেও রাক্ষসীর তৃপ্তি হয় নি। চড়ে দাঁড়িয়েছে স্বামীর বুকের ওপর, পায়ের তলায় পিষে মারবে বলে। ওর নাম নেব আমি ? ও আমাকে বাঁচাবে ? তার চেয়ে বাঁচবই না। কি দরকার বেঁচে ? ওই মা ভবানীর জাতটা বেঁচে থাকুক। সেই ব্যবস্থাই করে এসেছি। বিষটা সে নিজে খেত। বললে—হয় তুমি খাও নয়তো আমি খাব। তোমার হাত থেকে নিস্তার পেতেই হবে আমাকে। ফের যখন তুমি লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ফিরে এসেছ, তখন আজই একটা এসপার-ওসপার হওয়া চাই। এ ভাবে দু জনের বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই। কত করে বোঝালাম, ভুল করছ—আমি তোমার স্বামী নই। ছিঃ, নিজের স্বামীকেও চিনতে পারছ না ? হোক না সে লোকটা তোমার সুখের কাঁটা, তবু সে স্বামী তোমার। তাকে কি একটি বারের জন্যেও ভাল করে দেখ নি ? আর একটা লোককে স্বামী বলে মনে করছ, এতে তোমার লজ্জা করে না ? ঐ বুড়ীটা প্রয়াগেই মরত যদি আমি না আসতাম এখানে। এই বিশ্বাসে আমি এসেছি যে তুমি ঠিক নিজের স্বামীকে চিনতে পারবে। চিনে সবাইকে বলে বুঝিয়ে আমায় রেহাই দেবে। জানতাম না, মেয়েমানুষ এতটা নীচে নামতে পারে যে নিজের স্বামীকেও চিনতে পারে না।

ও মানতে চাইলে না। জ্বলে উঠল দপ করে। বললে—মিথ্যুক ভণ্ড ভীরু নির্লজ্জ কুকুর তুমি, তা আমি জানি। মরতে এত ভয় যে নিজের পরিচয়টা লুকোতে চাও। সারাটা জীবন আমি জ্বলে পুড়ে মরব তোমার

জন্যে। তুমি বেঁচে আছ, এইটে মনে পড়লেই আমি জ্বলে মরব। বেশ, তুমিই বেঁচে থাক, আমি মরছি। দেখিয়ে দিচ্ছি তোমায়, মরতে আমি ভয় পাই না। কি জীবন নিয়ে বেঁচে থাকবে তুমি? তোমার বউ তোমার মুখে লাথি মেরে আর এক জনের সঙ্গে আশনাই করছে, এ কথা সবাই জানে। তবু তুমি বেঁচে আছ। তবু তুমি আবার ফিরে এসেছ সেই বউয়ের কাছে। তার পর এখন মিথ্যে কথা বলে বাঁচতে চাচ্ছ। কুকুরেরও অধম তুমি। তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার, মনে হলেই মরতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, মরছি তোমার সামনেই। চেয়ে থাক, দেখ মরতে একটুও ভয় করে কি না আমার। দেখ, তোমার মত কুকুরের মুখে লাথি মেরে আমি চলে যেতে পারি কি না। হাত বাড়িয়ে গেলাসটা তুলতে যাচ্ছিল। ছোঁ মেরে তুলে নিলাম, তার পর ঢকঢক করে সবটুকু গলায় ঢেলে দিলাম তার চোখের সামনে। দেখুক ভাল করে, বিষ খাওয়াটা কত সোজা!

নিঃশেষে শেষ করে খালি গেলাসটা বাড়িয়ে ধরলাম তার দিকে, গেলাসটা ছুঁল না। তখন তাকিয়ে দেখি, সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে! একখানা হাত উঁচিয়ে এগিয়ে এল আমার সামনে, আমার থুতনিটা ধরে ওপর দিকে তুলে সাপের মত হিসহিস করে বললে—সেটা কই? সেই জড়ুলের দাগটা, তোমার গলায় মস্ত বড় একটা জড়ুল ছিল না!

বললাম—কোনও কালেই ছিল না।

দু পা পিছিয়ে গিয়ে বিশ্রী একটা আওয়াজ করে উঠল। প্রেতিনীর মত তাকিয়ে রইল আমার দিকে। প্রেতিনীর আওয়াজ বের হল গলা দিয়ে—তুমি কে? কে তুমি তা হলে!

বললাম—একটা পুরুষমানুষ, কিন্তু সেই পুরুষটা নই যাকে ঐ বিষটা খাওয়ালে তুমি মুক্তি পেতে।

বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল তার। বললে—কেন খেলে? কেন খেলে তা হলে?

বললাম—আর একটা পুরুষকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। না খেয়ে যদি পালাতাম, তুমি খেয়ে মরতে। মরবার সময় এই ধারণাই নিয়ে মরতে যে সব পুরুষই সমান। যে লোকটা তোমার পা চাটে, যার জন্যে তুমি তোমার স্বামীকে বিষ খাইয়ে মারতে চাইছিলে, সেই লোক-টার মত সব পুরুষকে মনে করতে নেই। মরবার সময় একটা নোংরা ধারণা নিয়ে মরতে, সেটা ভাল হত না! তাই খেলাম।

এক মুহূর্ত আর দাঁড়াল না আমার সামনে, ছুটে চলে গেল বিছানার পাশে। এক টানে তোশকটা তুলে লম্বা ছোরা একখানা নিয়ে তীর বেগে পৌঁছল ঘরের কোণে। সেখানে একটা ছোট দরজা ছিল। এক হেঁচকায় দরজাটা খুলে চোপাতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বার আষ্টেক ছোরা সুদ্ধ হাতখানা উঠল নামল। ডোমেরা যখন লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে কুকুর মারে, তখন যেমন কেঁদে ওঠে কুকুরটা, ঠিক সেই রকম শব্দ কানে গেল আমার। কিন্তু তখন আর দেরি করার সময় ছিল না সেখানে, যে ভাবে হোক পৌঁছতে তো হবে আপনার কাছে। তাই, চলে এলাম।

হাঁ, জগ্‌মোহন পৌঁছতে পেরেছিল আমার কাছে শেষ পর্যন্ত। পৌঁছবে না! আমার একমাত্র চেলা, প্রথম ও শেষ চেলা জগ্‌মোহন, ফিরে যদি না আসত আমার কাছে, তা হলে আমি কেমন করে মুখ দেখাতাম সমাজে! আবার যখন যেতাম কুম্ভে, তখন তো অনেকেই জিজ্ঞাসা করত ওর কথা। কি জবাব দিতাম তাদের। বলতাম নাকি, চেলাকে ফুসলে নিয়েছে। তখন জিজ্ঞাসা করত সকলে, কে ফুসলে নিয়েছে? কোন্ আখড়ার কোন্ মোহন্ত ফুসলে নিয়েছে? কোন্ মহাত্মার কাছে আবার মাথা মুড়ল জগ্‌মোহন? বলত সবাই কলকে মুখে তুলে—বেইমান হো গিয়া। তার পর সান্ত্বনা দেবার জন্যে কলকেটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরত।

বছর বছর কুম্ভযোগ হয়, আমরা সাধুরা গিয়ে জুটি। ট্যাক্স দিতে

হয় না, রোজগার করতে হয় না, ধার-দেনা করে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ল্যাজেগোবরে হয়ে বেঁচে থাকতে হয় না, এমন মানুষদের চাক্ষুষ দেখবার আশায় বিস্তর গৃহস্থও যায় কুম্ভে। গিয়ে আরও মন খারাপ হয় সকলের, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ফেরে। ভাবে, হায়রে হায়, কি মজাই লুটে নিলে ব্যাটারা নেংটি খিঁচতে শিখে। সাধে কি আর বলে, কৌপীনবন্ত হলেই ভাগ্যবন্ত হয়ে পড়ে।

তা বটে! অনেকের কৌপীন কপাল পর্যন্ত পৌছয়, কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। কিন্তু সে আর কটা রে দাদা! হাতের আঙ্গুলে গোণা যায় তেমন কপালগুলো। ঐ কপাল কৌপীনের আগাতেই থাকুক বা হাফ্-পেণ্টের ডগাতেই থাকুক, ও জাতের কপাল সর্বত্র সমান ফলদান করে। শেয়ার মার্কেটের শেঠ লাখরাজ ধোঁকাবাজ চোহেল কি তা হলে কৌপীন পরেন না কি!

যাক্—যা বলছিলাম। কুম্ভমেলায় গিয়ে সমাজের মাঝখানে বসে আমাকে আর ফাঁপরে পড়তে হয় নি। ছুনিয়ার বেইমানির বহর দেখে মাথা ঘামাতে হয় নি কোনও সাধুকে। আমার কাছে ফিরে এসে অনেক ঝঞ্ঝাট থেকে আমায় বাঁচিয়েছিল জগ্‌মোহন। কেউ আর তাকে আমার কাছ থেকে ফুসলে নিতে পারে নি। আরও কাছেই আমাকে তার জন্যে বিন্দুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় নি, হবেও না কোন কালে। ছোট্ট একটু ইঙ্গিত, অতি সংক্ষিপ্ত ছুটি কথা, চোখ উলটে তিন মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে কেটে কেটে উচ্চারণ করা রামজী জানে। ব্যস—আর কিছুই লাগবে না। জগ্‌মোহন সম্বন্ধে সব রকমের অনুসন্ধিৎসা সেখানেই পানিতে পরিণত হল। জয় সীয়ারাম করে প্রশ্নকর্তা তখন নশ্বর জগতে সবই ধোঁয়া, এই সত্যানুভূতি লাভ করার বাসনায় কলকেয় কষে দম লাগাবে।

আহা—নশ্বর জগতে সবই যদি ধোঁয়া হত!

তা যে হয় না, সেইখানেই হয়েছে মুশকিল। কোট প্যাণ্ট সাঁটা গৃহস্থ আর নেংটি-খেঁচা সাধু উভয়ের পক্ষেই ঐ এক মুশকিল, জগৎটা

নশ্বর বটে কিন্তু নশ্বরতাটুকু এ হেন ছিনে জোঁক যে রক্তশোষা শেষ না হলে কিছুতেই গা থেকে খসে পড়বে না। নশ্বর জগ্‌মোহন কোথায় গেল, তা নিয়ে সীতাপতি রামচন্দ্রজী মাথা ঘামান গে, তাতে আমার বড় বয়েই গেল। কিন্তু যাবার সময় ঐ ছিনে জোঁকটি যে লাগিয়ে দিয়ে গেল আমার গায়ে, তার কি হবে! নিজের আসল পরিচয়টা গুরুকে জানিয়ে গুরুদক্ষিণা দিয়ে গেল একটি প্রশ্ন—এখন কি হবে? দ্বারবঙ্গের নাতনীর বিষটুকু নিঃশেষে পান করা হয়ে গেল, কিন্তু ডাল-পটির হরবন্‌শ আহিরের কন্যা প্যারীর হাত থেকে বিষপাত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে গলায় ঢালা হল না যে, তার কি হবে? ইস্‌—প্যারী যদি সেই বিষ নিজের গলাতেই ঢেলে ফেলে!

অতটা বিষ গিলেও জগ্‌মোহন শান্তিতে ঘুমিয়ে পার হতে পারল না। আরও বিষ রয়ে গেল নশ্বর দুনিয়াটায়, সেই বিষটা হয়তো হর-বন্‌শ আহিরের মেয়ে প্যারী এক দিন গিলবে, এই দুশ্চিন্তায় জগ্‌মোহন বেচারা নশ্বর জগৎটা ত্যাগ করার সময়েও শান্তি পেল না। আমায় জিজ্ঞাসা করে গেল—তখন কি হবে! এবং সমস্যাটার সমাধান করার জন্যে ঢাকাপটির সামনে দাঁড়িয়ে এক দিন আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—“জয় সীয়ারাম।” চেপটা-মুখো কুড়ুলগুলো থমকে থেমে গেল। এক ঝুড়ি সাদা গোঁফ, নাকের ডগায় নিকেল ফ্রেমের চশমা ঝুলছে, বুকে এক বোঝা সাদা লোম, হাত ছয়েক লম্বা—এক মূর্তি মাথা নুইয়ে এল চালার তলা থেকে। এসে দু হাত জোড় করে বলল—“গোড় লাগি মহারাজ।”

আকাশ ফাটিয়ে আশীর্বাদ করলাম—“বোম্‌ ভোলা বাবা কৈলাস-পতি তেরা দুখ্‌হরণ্‌ করবে বেটা, গোরানাথ বিলকুল মনোবাঞ্ছা সফল করবে। লে—পর্‌সাদী লে।”

কপালটা নামাল। এক চিমটে ভস্ম তুলে নিলাম বাঁ হাতে ধরা কপালপাত্র থেকে। নিয়ে নাকের গোড়া থেকে সিধে চুল পর্যন্ত টেনে লেপে দিলাম। দিয়েই তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে পা চালালাম। এ ফুট-

পাথে ডালপটির সামনে তখন ছোট এক ভিড় জমে উঠেছে।

দু পা ফেলেছি কি ফেলি নি, পাঁচ সাতটা মানুষ ছিটকে এসে পড়ল পায়ের ওপর। কি ব্যাপার! না, কুছ্ সেওয়া নিতে চাকাপটি থেকে। নয়তো ওদের অমঙ্গল হবে যে।

বিকট চিৎকার করে হেসে উঠলাম—"সেবা করবি তোরা! বোম্ ভোলে গঙ্গাধর জটাধারী। সেবা করবি তোরা—অ্যাঁ? তা ধুনি লাগাব কোথায়? জয় কৈলাসপতি হরে। এ তো সবই দেখছি মাটি, খাক কাঁহা? মাটিতে গাড়ব নাকি ত্রিশূল—অ্যাঁ? তার পর যদি এই ত্রিশূল খুন পিতে চায়—তখন? ভবানী যদি জেগে ওঠে। না না—অমন বাত আর মুখে আনিস নি। যেতে দে, যেতে দে, পথ ছাড়। ভুখা ভবানী অসুরের বুকের খুন পান করে। অসুর চাই, অসুরের খুন চাই। বোম্ ভোলে মশানপতি মহাদেও, বোম্ ভোলে, বোম্ ভোল।"

বগলের ভেতর থেকে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূলখানা টেনে নিয়ে ডান হাতে বাগিয়ে ধরে অদৃশ্য অসুরের দিকে ধাওয়া করতে গেলাম। ওরা সবাই মিলে ঠ্যাং দু খানা জাপটে ধরল। না ধরে উপায়ও ছিল না। সব থেকে নামকরা থিয়েট্রিকাল অপেরা পার্টির সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মশায়ও অমন নিখুঁত অভিনয় করতে পারতেন না, একথা হলফ করে বলতে পারি। তবে কার ভূমিকাটি যে করেছিলাম, সেইটে শুধু বলতে পারব না। সাক্ষাৎ শিব, শিবানুচর নন্দীভৃঙ্গী, দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র, রাবণ, বিভীষণ, যাকে খুশী ভেবে নিক না দর্শকরা, তাতে অভিনেতার কি!

এর নামই হল মঞ্চ-স্বাধীন অভিনয়, যার ইংরেজী নাম হল স্টেজ-ফ্রী-অ্যাক্টিং। দর্শকদের অবাধ স্বাধীনতা থাকা দরকার। অভিনয় দেখতে এসে রামের অভিনয় দেখে শুধু রামকেই যদি মনে পড়ল, তা হলে আর স্বাধীনতাটুকু রইল কই! রামের অভিনয় দেখতে বসে রামকে মনে পড়বে, শকুনিকে মনে পড়বে, চাণক্যকে মনে পড়বে, শ্রীবৎস শ্রীগৌরাঙ্গ শিবাজী মহারাজ মায় শাজাহান পুত্র আওরঙ্গজেব-কেও মনে পড়বে, তবেই না ঐ স্টেজ-ফ্রী-অ্যাক্টিং হল।

অভিনয় সম্বন্ধে মতামত দেওয়াটায় এখানেই ক্ষান্ত হলাম। অধুনা সোজা উল্টো টেরা বেঁকা বহু রকমের রথে চড়ে বড় বড় সব অভিনয়-বিশেষজ্ঞগণ জলসা বসাচ্ছেন। এলোমেলো বক্তৃতা দিয়ে অঞ্জলি ভরে রূপ রুপা পকেটে পুরছেন, কিন্তু মঞ্চের তাতে লাভ হচ্ছে কি! অবশেষে সেই সত্যনারায়ণের পাঁচালীর অতি সত্যি কথাটাই ফলে গেল। 'তুষ অঙ্গার বিনা নায়ে আর কিছু নাই' বলেছিলেন সদাগরের জামাই। আহা—সদাগরের জামাইটি কত ভবিষ্যৎদ্রষ্টাই না ছিলেন! তুষের বদলে বসাও ক্ষুধা. আর, নায়ে কথাটির বদলে বসাও মঞ্চ, দেখ কি সুন্দর মেলে।

থাক বাবা এখানেই। ওধারে আবার সাহিত্যসমালোচকরা সজাগ হয়ে বসে আছেন। তাঁদের রক্তচক্ষু ঘরে বসে লিখতে লিখতেও দেখতে পাই। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ওঁদের আর্তনাদ—এই, এই, কি হচ্ছে এ সমস্ত! বলি হচ্ছে কি? লিখতে বসেছিলে একটা গাছের বিষয়, বলতে লাগলে নিজের চেলার কথা, এসে গেলে গরুর গাড়ি চাকা বানাবার কারখানার সামনে, তার পর আবার স্টেজে উঠতে চাচ্ছ যে! বলি ব্যাপারখানা কি হে? ইয়ার্কি মারবার জায়গা পাও নি বুঝি!

হ্যাঁ—তা সত্যি কথা বলতে কি, ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়াই হচ্ছে বটে। কিন্তু এটাও তো মিথ্যে কথা নয় যে লম্বা বিশটা বছর ধরে যে মানুষ চোর জোচ্চর সাধু ফকির পরহিতব্রতী পরের গলায় চাকু প্রদানকারী ইত্যাদি ইত্যাদি শত শত ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করে খেয়ে পরে বেঁচে আছে, তাকে এক বার ডাকাও হচ্ছে না আধুনিক নাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে। পোড়া কপাল আর কাকে বলে! আমার না নাট্য আন্দোলনের সেইটুকুই শুধু চেপে গেলাম।

ওদের ওখানেও চেপে বসতে হল।

খুঁজে পেতে পছন্দ করে ফেললাম, এধারের এই কোণটাকে। অর্থাৎ না বসলাম চাকাপটির আওতায়, না পড়লাম ডালপটির পাল্লায়।

দু ধারের দু দলই আসতে পারবে, এমন স্থানই নির্বাচন করা ভাল। একদম নির্ভেজাল নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চাই। সমস্ত বেওরাটুকু জানা চাই শোনা চাই বোঝা চাই। তার পর যথোচিত ব্যবস্থা করা চাই। একমাত্র চেলা জগ্‌মোহন যেখানে এখন আছে, সেখান থেকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে সব। জানতে পারবে, তার গুরু কিভাবে তার সমস্যাটির সমাধান করলে।

জায়গাটা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করা হল। কয়েক ঝুড়ি মাটি ফেলে পিটিয়ে শক্ত করে বেদী তৈরী হয়ে গেল। ওরা এরা উভয় পক্ষই হাত লাগালে। তাক লেগে গেল কি না সকলের। ডালপটি চাকাপটির মাঝখানে এই জায়গাটায় দু পক্ষের যৌথ আঁস্তাকুড়টা ছিল, সমবায় পদ্ধতিতে চালু ছিল আঁস্তাকুড়টা। সেই আঁস্তাকুড়ের আবর্জনার তলায় দু হাত মাটির নীচে এক শ আটটা মানুষের মাথার খুলি ডাঁই হয়ে রয়েছে। চাকাওয়ালা ডালওয়ালাদের উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হয়তো জানলেও জানতে পারেন খুলিগুলোর সংবাদ। কিন্তু সাক্ষী দিতে তো আর আসবেন না। অগত্যা অঘোরী বাবার কথাটাই বিশ্বাস করতে হল সকলকে। বিশ্বাস ব্যাধিটা আবার ডেঙ্গু-জ্বরের মত ব্যাপার। তিন দিনেই গায়ের ব্যথা কমতে শুরু করে, পাঁচ দিনের দিন রুগী ঝোল ভাত খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। সেদিকে আবার সাবধান হতে হল। তিন রাত্রি কাটিয়েই ভোর বেলা দু পক্ষের মেয়ে পুরুষ সকলকে জড়ো করলাম। দুটো ছোকরাকে স্নান করে দু কলসী জল আনতে বললাম গঙ্গা থেকে। সবায়ের সামনে ঢালালাম সেই জল মাটির বেদীটার ওপর। তার:পর তাদের হুকুম করলাম, বেদী ভেঙে সাবধানে মাটি সরাবার জন্যে। তারা মাটি সরাতে লাগল। ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে ভয়াবহ উচ্চারণের মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলাম আমি। অচিরাৎ ঘটবার মত ব্যাপার একটি ঘটে গেল। যে দু-জন ছোকরা মাটি সরাচ্ছিল, তারা বিকট চীৎকার করে উঠে ছিটকে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। বসলাম তখন গিয়ে

গর্তটার পাশে। তৎক্ষণাৎ একটা মিসমিসে কালো বকরা আর তিন বোতল মদ আনার হুকুম করলাম। বকরা ডালপটিতেই ছিল, কিন্তু সেই সাত সকালে মদ মিলবে কোথায়। তা বললে চলে কি করে। দেবী চণ্ডী জেগেছেন, খেতে তো দিতে হবে তখুনই। নয়তো—

নয়তো যা হতে পারত, তা আর হতে পেল না। দেশী মদের দোকান-দার ভগবান সাউকে তার বাড়ি থেকে টেনে বার করা হল। দোকান খুলিয়ে দশ বোতল মদ উঠিয়ে নেওয়া হল। দাম—কোই বাত নেহি। ভগবান সাউ কম ভক্ত নন! মদ সহ তিনি স্বয়ং উপস্থিত হলেন। তখন বকরাটাকে গর্তের ওপর ধরে এক হাত লম্বা একখানা ভোজালির এক কোপে শেষ করা হল। হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, খুনটুকু যেন সব —গর্তের মধ্যে পড়ে।

খুনের পর মদ। তিনটি বোতল সোজা উবুড় করে ধরলাম গর্তের ওপর। অবশেষে গর্তে হাত ঢুকিয়ে তুললাম একটি মানুষের মাথার খুলি। আর এক বোতল মদ খরচা করে খুলিটাকে বেশ করে ধুয়ে ফেললাম। এবং খুলিটা মদে পূর্ণ করে চুমুক লাগালাম। নিশ্চিন্ত, বাকী এক শ সাতটা খুলি থাকুক দু শ হাত মাটির তলায় ডাঁই হয়ে। ভবিষ্যতে যদি কোনও মহাতপা অঘোরী বাবা আসেন এখানে, এবং তাঁর যদি গরজ পড়ে, তিনি একটি তুলবেন তখন। দরকার কি আমার সব কটা খুলিকে জ্বালাতন করে।

আসন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

আসল কর্মটি খালি বাকী রইল। প্যারী কোথায়! ডালপটির হরবনশ আহিরের মেয়ে প্যারী কই। প্যারী আসবেই। হয়তো ইতি-মধ্যে এসেওছিল। হয়তো ভিড়ের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন অঘোরী বাবার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, চট করে দু শ হাত মাটির তলা থেকে দুশ বছর আগে-কার মানুষের মাথার খুলি তুলে আনবার শক্তি থাকলেও প্যারীকে চেনবার শক্তি অঘোরী বাবার নেই। প্যারী যে দু শ বছরের মড়া নয়;

সে মাত্র বিশ-বাইশ বছরের জ্যান্ত একটা মেয়ে। মড়া চেনা যত সহজ, জ্যান্ত চেনা কি তত সোজা। মড়া মড়াই, সে বেচারা ভোল ফেরাতে পারে না। কিন্তু জ্যান্তরা হরদম ভোল পালটায়। মুশকিল যে ঐখানেই, জ্যান্তদের কাছে ঘোর অঘোর কোনও ফন্দিই খাটে না।

আর জ্যান্তরা যখন ফন্দি আঁটে, তখন মড়ারা সেই ফন্দির ফাঁদে পড়ে ছটফট করে মরে।

চাকাপটির শিউশরণ তার বুকের ওপরের এক গাদা পাকা চুলে হাত চালাতে চালাতে শোনালে, কি ভাবে কেমন করে তার জলজ্যান্ত ছেলে ধনুস্‌ধারী বেমালুম গায়েব হয়ে গেল ঐ ডালপটির ডালকুত্তা-দের ফাঁদে পা দিয়ে। হরবন্‌শ আহির মোষ পুষে দুধ বেচতে বেচতে যমরাজের মত সর্বশক্তিমান হয়ে উঠল। ডালপটির ওধারে মস্ত এক খাটাল খাড়া করে ফেললে। খোল ভুষি বেচে ভুজাওয়ালারা বড় লোক হয়ে গেল। কিন্তু লোহাওয়ালা মোতিলাল মাড়োয়ারীর বিস্তর টাকা, তার ছেলে হীরালাল দু হাতে টাকা খরচা করে আহিরকে তাক লাগিয়ে দিলে। ভুজাওয়ালারা হীরালালের টাকা খেয়ে ধনুসধারীকে খুন করালে।

"খুন করালে!" আঁতকে উঠলাম। তৎক্ষণাৎ সামলে গেলাম। ভাগ্যে আর কিছু মুখ ফসকে বার হবার আগেই শিউশরণ আবার কথা বলে উঠল। ধনুস্‌ধারীকে খুন করেছে, তার পর জগ্‌মোহন বিষ খেয়ে মরেছে। খুনই হোক বা বিষই থাক, ও একই কথা। দু দিন আগে পিছে ঘটেছে ঘটনাটা, ও একই কথা। শিউশরণের গল্পে মন দিলাম।

"হাঁ মহারাজ, ওরা খুন করলে। ফন্দি করে এমন একটা ব্যাপার খাড়া করে দিল তার চোখের সামনে যে তার পর আর সে বেঁচে থাকতেই রাজী হল না। নিজের জীবনটা নিজেই শেষ করে দিলে। হায় রে হতভাগা—ঝুটমুট প্রাণটা দিলি! যে মেয়ের জন্যে মলি, সে হতভাগী মোটে জানতেই পারল না, কি সর্বনাশ তার হয়ে গেল।

মেয়েটা পাগল হয়ে গেল।”

“পাগল হয়ে গেল!” ফিসফিস করে আর একবার উচ্চারণ করলাম “পাগল হয়ে গেল!” শিউশরণ নিকেলের চশমাখানাকে নাকের ডগা থেকে খুলে তার কাঁধের গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বললে—“হাঁ বাবা, বিলকুল পাগল হয়ে গেল মেয়েটা। আহা হবে না! কোনও কসুর করে নি সে, কিছুই জানত না। যখন শুনল, ধনুস্‌ধারী তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, তখন পাগল হবে না তো কি!” শিউশরণ মুখ নীচু করে চশমার কাঁচের গায়ে ময়লা রইল কি না দেখতে লাগল। কি করে বুঝবে! কোলের কাছে বসানো তার লণ্ঠনের কাঁচে যে ভয়ানক কালি পড়ে গেছে।

সময় লাগল সামলাতে। তার একমাত্র ছেলের মৃত্যু না হরবন্‌শ আহিরের মেয়েটার পাগল হয়ে যাওয়া, কোনটা বেশী চোট সেই লোম-ওয়ালা বুকখানার মধ্যে, ঠাওর করবার জন্যে বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। ধুনির গুঁড়িটা ধিকধিক ঠিক জ্বলতেই লাগল, রাত যেন আর গড়ায় না।

রাতেই আসত শিউশরণ। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমার পাশে এসে বসত বৃদ্ধ। এক প্রাণী তখন থাকত না। থাকলে কি আর মুখ খুলতে পারে শিউশরণ। সে যে ছেলের বাবা, ছেলের ভালবাসার কাহিনী বাপের মুখ থেকে বেরোয় কি করে অপর মানুষের সামনে। ধনুস্‌ধারী যে তার ছেলে ছিল। বাপ হলে হবে কি, বাপেরও বুক থাকে। সেই বুকের ওপর রাশীকৃত সাদা চুল গজালে কি হবে, ভেতরে অন্ধকারের গর্তে লুকানো থাকে কালো কালো ছবি। সেগুলোর গায়ে আলো লাগলেই সব বরবাদ হয়ে যাবে। অন্ধকারেই সেগুলো বার করে দেখা যায়। অন্ধকারেই সেই নেগেটিভ থেকে ছাপ তুলে নিতে হয় পজিটিভের ওপর। তার পর পর পর ঠিক ভাবে সাজাতে পারলেই আগাগোড়া একটা কাহিনী খাড়া হয়ে গেল। এখনও একটু আধটু ছেঁটেছুটে নিতে পারলেই বাজিমাত। প্রচণ্ড বেগে ঘটনাস্রোত চোখের

সামনে ছুটতে লাগল। দম আটকে দেখ তখন বসে।

দেখতে লাগলাম আমিও।

ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছে, এক হাঁটু কাদা জমেছে ডালপটির ভেতর, সন্ধ্যার পরেই ঘোর অন্ধকার হয়ে পড়েছে ডালপটিটা। ধনুস্‌ধারী চলেছে কাদার ভেতর দিয়ে ভিজতে ভিজতে। যেতে তাকে হবেই, পৌঁছতেই হবে ঠিক জায়গায়। যে সংবাদ সে পেয়েছে, তাতে না গিয়ে তার উপায় নেই। হরবন্‌শ আহিরের মেয়ে প্যারী লোহাওয়ালা মোতি-লাল মাড়োয়ারীর ছেলে হীরালালের সঙ্গে ফেঁসে গেছে, এটা সে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবে কেমন করে। ডালপটির লোকেরা সবাই জানে হীরালাল লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া আসা করে আহিরের ঘরে, শুধু ধনুস্‌ধারীই জানে না। জানবে কেমন করে, সন্ধ্যার পরে এক দিনও যায় না তো সে আহিরের ওখানে। মাঝে মাঝে সকালের দিকে যায়। দূর থেকে দেখে, প্যারী কাজ কর্ম করছে। হয় দুধ মাপছে, নয়তো খোল ভুষি ছড়াচ্ছে কোনও গামলায়। কিংবা হয়তো একটা কচি বাচ্চার গলা জড়িয়ে ধরে তার কানের কাছে হজগজ বকে চলেছে। ধনুস্‌ধারীকে দেখতে পেলেই সরে যায় সেখান থেকে, একটি বার মাত্র এক পলকের জন্যে হয়তো তাকায় ধনুস্‌ধারীর চোখের দিকে। এই এক পলকের মধ্যেই যা বলা কওয়ার, সব শেষ হয়। আহিরের ওখানে অনেকগুলো ডালপটির ছোকরা কাজ করে। তাদের কারও সঙ্গে দু-চারটে বাজে কথা বলে বাজারের দিকে এগিয়ে যায় ধনুস্‌ধারী। ব্যাপারটা সন্দেহ-জনক নয় মোটেই, যাচ্ছিল সে বাজারেই, আহিরের খাটালে এক বার ঢুকে পড়ল। দোষই বা কি তাতে এমন, সবায়ের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হৃদ্যতা রয়েছে, দুটো কথা বলে গেলে দোষ হয় নাকি। হয়তো একটু খইনিই চেয়ে নিলে কারও কাছ থেকে। কিংবা একটু খোঁজ নিয়ে নিলে, টাটকা ঘিউ কিছু মিলবে কিনা। ঘিউটা টাটকাই মিলত কি না আহিরের খাটালে, সংবাদ নিলে দোষ কি!

না, দোষ তেমন কিছু মনেও করত না কেউ। হরবন্‌শ নিজেও

কিছু মনে করত না। কারণ ধনুস্‌ধারীর ঠাকুমা, অর্থাৎ শিউশরণের মা নিজে গিয়ে প্যারীর মায়ের কাছে কথাটা পাড়লে। জাতের ব্যাপার ছিল কি না একটু, আহিররা যে নিজেদের খুবই উঁচু জাত বলে মনে করে। বেশ সাবধান হয়ে কথাটা পাড়তে হল বুড়ীকে। হরবন্‌শ খুশী হয়ে উঠল। অত বড় একটা চাকাপটির মালিকের একমাত্র ছেলে, মন্দ হয় না সম্বন্ধটা। আরে জাতের গুমোর ছোড় ভেইয়া। লেড়কা-লেড়কীতে যখন মনের মিল হয়ে গেছে—ব্যাস—ও সব বাত যেতে না দাও। ওরা সুখী হলেই হল। খুশী ওরা যথেষ্টই হয়ে উঠল। তার প্রমাণ, এক এক দিন দুপুরবেলা প্যারীকে দেখতে পাওয়া যেত না বাড়িতে। কাঠফাটা রোদ, আগুন হয়ে উঠেছে মাটি, মোষগুলোকে নিয়ে হরবন্‌শ চলে গেছে গঙ্গায়। সেই বিকেল পর্যন্ত মোষেরা গঙ্গায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পড়ে থাকবে। স্বয়ং হরবন্‌শকেই থাকতে হবে সেখানে। বহুত টাকার মাল যে একটা মোষ, চাকর-বাকরের ওপর নির্ভর করে গঙ্গায় পাঠানো ঠিক উচিত হয় না। লাগল হয়তো নাক ডাকিয়ে ঘুমতে চাকরগুলো কোনও গাছতলায় পড়ে, সেই ফাঁকে একটা জীউ জল থেকে উঠে সটান চলতে শুরু করলে তার আগের মালিকবাড়ির উদ্দেশে। আরে ভইষাকা কি কুছ ঠিক আছে! মিজাজ্‌ বিগড়াল তো—ব্যাস—সিধা আপনা পথ পাকড়াল। তখন!

শুধু ভইষা কেন, নিজের মেয়েও মিজাজ্‌ বিগড়ালে আপনা পথ পাকড়াতে পারে। বাপ যেখানে ভইষা নিয়ে যেত, মেয়ে ঠিক তার উলটো দিকের পথ পাকড়াত। খাটালের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে বড় সড়ক পার হয়ে ইঁটখোলায় একবার নামতে পারলেই হল। তার পরেই ছুট, দু মানুষ ভোর উঁচু ইঁটের পাঁজার আড়ালে পৌঁছতে পারলে হয় এক বার, তখন দেখুক কে দেখবে। ছুটতে ছুটতে একদম নীলকুঠির জঙ্গলে উপস্থিত। ভয় পাবার কিছু নেই, ভইষা কি আগের মালিকের কাছে যেতে ভয় পায়! হরবন্‌শ আহিরের মেয়ে প্যারীই বা তার আসল মালিকের কাছে যেতে ভয় পাবে কেন! মালিকটি আগে

থাকতে পৌঁছে ঠিক লুকিয়ে বসে আছেন কোনও হৌজের মধ্যে। প্রকাণ্ড হৌজ কয়েকটা টিকে রয়েছে সেই জঙ্গলে, এক সময় তাতে নীল ভেজানো হত। তারই কোনটার মধ্যে লুকিয়ে আছেন মালিকটি। নির্ঘাত আছেন।

আছে কি নেই দেখবে !

প্যারীর চোখ ছুটি চকচক করে উঠল। দম নিয়ে ডান হাতের পাতা-খানি মুখের উপর চাপা দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করলে—"কু-উ-উ-উ-উ"। পরমুহূর্তেই বেমালুম অন্তর্ধান। কাঁপতে কাঁপতে শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলময়, রেশটুকু মিলিয়ে যাবার আগেই আসল মালিক উদয় হলেন সেই জায়গায়। তার পর—তার পর খুব তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরত প্যারী। মা হয়তো জিজ্ঞাসা করল—কোথায় গিয়েছিলি রে ?

উত্তর যুগিয়েই আছে মেয়ের ঠোঁটের আগায়—"এই ডালপটির বাসন্তীয়ার কাছে।" যে কোনও নাম বলে দিলেই হল। অতগুলো মেয়ে রয়েছে ডালপটিতে, যার নামটা আগে মুখে আসে, তার কাছেই গিয়েছিল প্যারী। এতে আর দোষের কি আছে !

না দোষের কিছু ছিল না বটে, তবে তাড়াতাড়ি বিয়েটা হলেই লেঠা চুকে যেত। ছুপুর রোদে পা পুড়িয়ে নীল কুঠিতে ছুটে যাওয়া, তাও মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে, তাও আবার সাত আট দশ দিন অন্তর। না, অত পোষায় না বাপু। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে গেলেই হয়।

ধনুস্‌ধারীর মতও তাই, কিন্তু পণ্ডিতজী যে মাঝখান থেকে বাধিয়ে বসেছে হাঙ্গামা। পঞ্চাংগ্ দেখে সেই শ্যাওন কা ঝুলন বাদ তারিখ বাতলে দিয়েছে। সুতরাং আর কি করা যাবে, নীলকুঠির জঙ্গলেই মাঝে মাঝে দেখা হওয়া চাই। আরে হলই বা আধ ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা কি কিছু কম নাকি। নাও, এখন শোনাও একখানা কাজ্‌রী কানে কানে। হলই বা বোশেখ মাস, ফাটলই বা মাথার চাঁদি নীলকুঠিতে আসতে, তা বলে কাজ্‌রী শোনাবে না কেন ? চোখ বুজে ফেল না, চোখ বুজে ফেল।

চোখ বুজে কাজ্‌রী ধর, দেখবে, শাওন একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ধ্যেৎ, খালি কাজ্‌রী আর কাজ্‌রী। আর আমি আসছি না এখানে। ধরা পড়লে বাবা তুলে আছাড় মারবে। প্যারী রাগ করে আর একটু গা ঘেঁষে বসে। ধনুস্‌ধারী আর কি করবে তখন, এক হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে থাকে। ভাবে, কিছু টাকা প্রণামী দিলে হয় পণ্ডিতজীকে, তা হলে হয়তো লোকটা শাওনের অনেক আগেই একটা দিন খুঁজে পাবে পঞ্চাংগ্‌ খুলে। কিন্তু সত্যিই তো আর পণ্ডিত-জীকে ঘুষ দিতে যাওয়া যায় না।

যেখানে যায় ঘুষ দেওয়া, সেখানে ঘুষের লোভ দেখিয়েও অনেক কাজ হয়। মোতিলাল মাড়োয়ারীর ছেলে হীরালাল ডালপটির ভাল-কুত্তাদের ভেতরে ভেতরে কিনে ফেললে। হরবন্‌শ আহির ভঁইষের সঙ্গে থাকতে থাকতে বিলকুল ভঁইষের বুদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল! চাকা-পটির মালিকের ছেলের চেয়ে লোহাওয়ালার ছেলে অনেক ভাল জামাই হবে মনে করলে। ভঁইষের দুধ বেচার চেয়ে ঘিউকা আড়তদার হওয়া ঢের বড় কথা। হীরালাল তাকে সমঝিয়ে দিল, ঘিউকা আড়তদার হয়ে গদিতে বসে থাকা কত বড় সৌভাগ্য।

আহির—তার আসল চেহারা জাহির করলে।

তার পরের ব্যবস্থা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি নিখুঁত। ডালপটির লোকেরা অনবরত ধনুস্‌ধারীর কানে বিষ ঢালতে লাগল। হীরালাল মাড়োয়ারী হররোজ যায় কেন হরবন্‌শ আহিরের আস্তানায়? হীরালাল নাকি হরবন্‌শের মেয়েকে শাড়ি দিয়েছে, গয়না দিয়েছে। হীরালাল নাকি সন্ধ্যার পরেও অনেকটা সময় আহিরের ওখানে থাকে। এমন কি, ধনুস্‌ধারীকে দেখিয়েও দিলে অনেকে যে হীরালাল বেশ রাত করে আহিরের ওখান থেকে ফিরছে। যে সব ছোকরারা খাটালে কাজ করত, তারা বললে, হীরালাল কি করে ওখানে গিয়ে তা যদি দেখতে চাও, তো সন্ধ্যার পরে এস এক দিন, স্বচক্ষে দেখে যাও।

ওধারে নীলকুঠির জঙ্গলে কাজরী শোনা বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ যে-দিন দেখা হয় প্যারীর সঙ্গে, সেদিন সে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে গেছে। বলে গেছে, বনে জঙ্গলে আর সে দেখা করতে পারবে না। ভয়ানক বদনাম হয়ে গেছে নাকি তার। গালমন্দ বকাবকিও নাকি হচ্ছে ঘরে। লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করে বদ মেয়েরা, সে তো বদ মেয়ে নয়।

ধনুস্‌ধারী যথাপূর্ব বায়না ধরেছিল, সে কি হতে পারে কখনও ? এত দিন তোমায় না দেখলে যে মরে যাব।

প্যারী ফোঁস করে উঠেছিল—ছিঃ, শরম লাগে না তোমার। আমি না তোমার বউ হব। নিজের বউ বকুনি গালাগালি খাচ্ছে, তাতে তোমার মনে বাজছে না। বউটাকে যদি ধরে মারে, তবেই তুমি শান্তি পাও। ছিঃ—কি স্বার্থপর মানুষ!

আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল ধনুস্‌ধারী, আর কথা যোগায় নি। সব সময় সব জাতের কথার ওপর কথা যোগায় না।

তার পর ঘরে ফিরে জ্বলুনি, শাওন কবে আসবে!

তার সঙ্গে আর এক জ্বলুনি, এক-আধ বার দেখা করতে গেলে কি এমন ক্ষতি হত তার!

সর্বশেষে সেই জ্বলুনির ওপর শুরু হল নুনের ছিটে পড়া। ডাল-পটির লোকগুলো হীরালালের নুন খেয়ে নুনের দাম দিতে শুরু করলে।

শাঁখের করাতের তলায় পড়ল ধনুস্‌ধারী। আসতে যেতে কাটছে করাত তার বুকখানা। এখন বেচারা যায় কোথায়!

যাওয়ার ডাক এসে পৌঁছল অবশেষে।

বেরিয়ে পড়ল ধনুস্‌ধারী। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকারে এক হাত সামনে নজর পড়ে না, ডালপটির কাদায় হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে যায়। তবু সে চলল। যেতে তাকে হবেই। গিয়ে পৌঁছবে যখন, তখন কি সে দেখতে পাবে! ভাবতে চেষ্টা করবে না সে, কিছু ভাবতে চেষ্টা করবে না। খবরদার—

নিজেকে একটা প্রচণ্ড ধমক লাগাল—খবরদার, ফের যদি কোনও খারাপ কথা ভাববি প্যারীর সম্বন্ধে তা হলে—জিভখানাকে কষে কামড়ে ধরল মুখের মধ্যে। কিছুতেই প্যারী সম্বন্ধে কোনও বাজে ভাবনা করা চলবে না।

ডালপটির ছোকরা খাটালের ভেতর লুকিয়ে বসে ছিল। হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে চড়িয়ে দিল একটা খড়ের গাদার ওপর। সেখান থেকে দেখিয়ে দিল একটা ছোট জানলা। জানলার ভেতর দিয়ে নজর পড়ল ঘরের মধ্যে। আলো জ্বলছে, হীরালাল মারোয়াড়ী জানলার দিকে মুখ করে খাটিয়ার ওপর বসে আছে। আর এক জন বসে আছে তার কোলের ওপর। হীরালাল তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। তাই তার মুখখানা দেখা গেল না।

দেখবার আর দরকার হল না। তৎক্ষণাৎ ধনুস্‌ধারী নেমে পড়ল খড়ের গাদা থেকে। যা দেখেছে, তাই যথেষ্ট। টনটনে জ্ঞান আছে তার, হরবন্‌শ আহিরের ঘরে তার মেয়ে আর স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ নেই।

ব্যস্—তার পর আর ধনুস্‌ধারীকে কেউ কোনও দিন জ্যান্ত দেখে নি।

প্যারীকে কিন্তু জ্যান্তই ফিরিয়ে এনেছিল তার বাবা, মেয়ের মামার বাড়ি থেকে। জ্যান্ত না আনলেই বোধ হয় ছিল ভাল। ফিরে এসেই প্যারী জানতে পারল ওদের শয়তানী ষড়যন্ত্র। ডালপটির একটা মেয়েই দাঁত বার করে হাসতে হাসতে সব বলে দিলে। কেমন করে আর একটা মেয়েকে যোগাড় করে এনে হীরালাল মাড়োয়াড়ীর কোলে তাকে বসিয়ে বেকুফ ধনুস্‌ধারীর মাথাটা খাওয়া হয়েছে, সেই মজার কথাটা শুনিয়ে দিলে প্যারীকে। শুনেই সে ছুটে চলে এল শিউশরণের বাড়িতে। শিউশরণের মায়ের পায়ের ওপর মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে চেঁচাতে লাগল—

"বলে দে বুড়ী, শিগগির বলে দে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস নাতীকে। শিগগির বল।"

কে কি জবাব দেবে।

দিনের পর দিন চলে গেল, মাসও যায়। প্যারী ঘুরতে লাগল। গঙ্গার ধারে জঙ্গলে জঙ্গলে নীলকুঠিতে, ছুটে বেড়াতে লাগল হরবন্‌শ আহিরের মেয়ে। আহির কয়েক বার ধরে নিয়ে গিয়ে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। ছাড়া পেলেই ছুট, কার সাধ্য প্যারীকে আটকায়। শেষে এক দিন নিজেই ফিরে এল সে, সোজা এসে দাঁড়াল শিউশরণের কারখানার সামনে। হঠাৎ উৎকট দুর্গন্ধে দম আটকে গেল কারখানা সুদ্ধ মানুষের। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল সবাই, আহির-কন্যা প্যারী এসে দাঁড়িয়েছে, কাঁধের ওপর ছেঁড়া চটে জড়ানো একটা মোট নিয়ে। কি আছে ওর কাঁধে।

সন্তর্পণে নামাল সেই মোটটা প্যারী কারখানার সামনে। সাবধানে আলতো ভাবে খুলে ফেলল চটখানা। দুর্গন্ধটা এক শ গুণ বেড়ে গেল। এক বার মাত্র সেদিকে তাকিয়েই সবাই মুখে চোখে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলল। কারখানা সুদ্ধ মানুষ মারা যাবার উপক্রম।

তার পর প্যারী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, কোথায় সে পেয়েছে ধনুস্‌ধারীকে। নীলকুঠির জঙ্গলে একটা শুকনো ইঁদারা আছে। জঞ্জালে প্রায় বোঝাই হয়ে আছে ইঁদারাটা। সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছে ধনুস্‌ধারীকে। ধনুস্‌ধারীকে শেষ পর্যন্ত সে খুঁজে বার করেছে।

পচা গলা শবটাকে কোলে নিয়ে মহা খুশী হয়ে বসে রইল কারখানার সামনে পাগলী, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে তখন পাগলীর সামনে গিয়ে তার ধনুস্‌ধারীকে কেড়ে নেবে।

তার পর কি হল!

কোথায় গেল প্যারী তার পর!

কে তাকে আশ্রয় দিলে!

না, আর একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারব না, প্যারীর গল্প ঐ কারখানার সামনেই শেষ হল। তার পর আর একটি কথা আমার

বলে নি শিউশরণ, আমিও জিজ্ঞাসা করি নি। জিজ্ঞাসা করার গরজ ছিল না আমার, তা বলব না। যথেষ্টই ছিল গরজ, কিন্তু শক্তি ছিল না। তা ছাড়া লাভই বা আমার হত কতটুকু আরও প্যারীর গল্প শুনে। আমার চেলা জগ্‌মোহনকে পেতাম কোথায় তখন যে ছুটে গিয়ে তাকে প্যারীর খবরটা শুনিয়ে আসব!

শুনিয়ে আসতে পারলেই বা লাভ হত কতটুকু!

বড় ভয় ছিল জগ্‌মোহনের, প্যারী যদি বিষ খায়। জগ্‌মোহন আমায় অকপটে জানিয়েছিল তার মনের কথা। বলেছিল—হীরালাল কিছুতে বাঁচাতে পারবে না প্যারীকে, প্যারীর মূল্য হীরালাল কি বুঝবে। কেড়ে নিলেই কি সব জিনিস ভোগ করা যায়। হাঁ, হীরালাল প্যারীকে কেড়ে নিয়েছে বটে আমার কাছ থেকে, কিন্তু বাঁচাতে পারবে তো। মানে, প্যারীকে আমি চিনি কি না, তাই বড় ভাবনায় পড়ে গেছি গুরুজী। যেদিন প্যারী তার ভুলটা বুঝতে পারবে, সেদিন কি হবে!"

জগ্‌মোহনকে যদি কোথাও পেতাম, তা হলে নিশ্চয়ই জানিয়ে দিয়ে আসতাম যে প্যারী মোটে ভুলই করে নি। সুতরাং কোনও দুশ্চিন্তা নেই। হীরালাল মোটে ছুঁতেই পারে নি প্যারীকে। প্যারী তার ধনুস্‌ধারীকে খুঁজে বার করে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসে ধনুস্‌ধারীর বাবার কারখানার সামনে বসে পড়েছিল। উৎকট দুর্গন্ধে প্রাণ যায় তখন সকলের, হীরালালের বা তার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কারও সামর্থ্য ছিল না তখন প্যারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার। প্যারীর ধনুস্‌ধারাই প্যারীকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। ধনুস্‌ধারী দেখিয়ে দিয়েছে, কি শক্তি আছে তার। একলা—একদম্ একলা ধনুস্‌ধারী ঠেকিয়েছে সকলকে। কারও সাধ্য হয় নি, ধনুস্‌ধারীর দুর্দান্ত দুর্গন্ধকে জয় করবার। এক মাত্র প্যারী ছাড়া ধনুস্‌ধারীর কাছে কেউ পৌঁছতে পারে নি। আর এক মাত্র ধনুস্‌ধারী ছাড়া কেউ পারে নি প্যারীকে স্পর্শ করতে, এক প্রাণী নয়।

তা হলে আর সমস্যাটা কোথায় !

সমস্যাটা রয়ে গেল প্যারীকে নিয়েই কিন্তু। মানে—ধনুস্‌ধারীকে সে রাখতে পেরেছিল তো কাছে ! ধনুস্‌ধারী তো আর হীরালাল নয়। লোহার ব্যবসা, ঘিউএর ব্যবসা, টাকার ব্যবসা, কোনও ব্যবসাই যে বুঝত না ধনুস্‌ধারী। স্রেফ একটি মাত্র ব্যবসাই বুঝত। ভয়ানক মারাত্মক ব্যবসা সেটি, ঝুঁকিও যেমন ঝঞ্ঝাটও তেমনি। এক মুহূর্ত এধার ওধার হলেই একেবারে ব্যবসার দফা গয়া। ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গলায় ঢেলে দিতে হবে তৎক্ষণাৎ ব্যবসার মূলধনটুকু, নয়তো আর এক জন সেটুকু মেরে দেবে। ইস্—তা হলে কি হবে। ধনুস্‌ধারীকে যে আমি চিনতাম। অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে একটি চেলা পেয়েছিলাম। কপালে সইল না, হারাতে হল। না না, ফুসলে কেউ নিতে পারে নি তাকে আমার কাছ থেকে, মোটেই বেইজ্জত হতে হয় নি আমাকে আমার চেলার জন্যে। তবু সেই চেলাটিকে খোয়াতে হল। কি করব ! হাড় আকখুটে জিনিসের কারবার করত কি না আমার চেলা, তাই তাকে হারাতে হল। কি করব !

বিষের কারবার কি করতে আছে।

হারো বা জেত, দুই সমান। দেউলিয়া বনতে হবেই। দূর তোর ব্যবসার নিকুচি করেছে। অমন ব্যবসার মুখে মার ঝাড়ু।

তাই তো ফিরে এলাম।

মানে প্যারীর খবরটা একটু জানতে পারলে একটু নিশ্চিন্ত হতাম। ধনুস্‌ধারীকে ঠিক আগলে আছে তো প্যারী। আমি পারি নি কি না, আমি হেরে গিয়েছিলাম নিজের চেলার কাছে। প্যারী নিশ্চয়ই হারে নি, প্যারীকে নিশ্চয়ই ফাঁসি দিতে পারে নি ধনুস্‌ধারী। বিশ্বাস নেই, কিছু বিশ্বাস নেই অমন মানুষকে। বিষের কারবার যারা করে, তাদের মোটে বিশ্বাস করা যায় না। প্যারীকে একটু সাবধান করতে পারলে হত। সেই আশাতেই ফিরে এলাম আবার।

যাঃ, কিছু নেই। কোথায়ই বা সেই চাকাপটি ডালপটি, কোথায়ই বা আহিরের খাটালটা! সব কোথায় গড়িয়ে চলে গেছে।

যাক্ গে, কিন্তু প্যারীর সংবাদটা তো পাওয়া চাই।

তা কে সেই সংবাদ দিতে পারে আমাকে?

পারে এই গুল-মোর।

গুল-মোর নিশ্চয়ই পারে প্যারীর খবর বলতে। বলবে কি! যা গুমোর হয়েছে মেয়ের এক পায়ে পাথুরে মল পরে, মোটে কথাই বললে না। মনে করছে, কি কাণ্ডই না করেছি পায়ে মল পরে। আহা, কি মানানই না মানিয়েছে। ধেড়ে খুকীর একটু লজ্জাও করে না! বেহায়ার হদ্দ কোথাকার! আর এখন যদি আমি বলে দিই ওর ভক্তদের সব কথা।

এই তো সেদিন, মনে হচ্ছে যেন এই গত বছর বা তার আগের বছরের কথা, রথের মেলা থেকে কিনে এনেছিলাম আমি ওকে মাত্র দশটা পয়সা খরচা করে। এই এতটুকু, থরথর করে কাঁপত। সদাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম, মলো বুঝি!

তার পর সেই রক্তস্নান হল। রক্তস্নান হবার পরে ধনুস্ধারীর বাবা গণ্ডা গণ্ডা লোহার বেড় দিয়ে ঘিরে ফেললে। আমিও চলে গেলাম।

এত দিন পরে ফিরে এসেছি, একটা কথাও বলা হচ্ছে না। যেন চেনেই না মোটে। হাড় পাজী আর কাকে বলে!

বেশ হত, যদি একটা বট বা অশত্থ বা নিমের চারা নিয়ে এসে লাগাতাম।

এত দিন পরে ফিরে এসে এই ধেড়ে খুকীর দেমাক দেখতে হত না। ইস্—কথা না বললি তো বড় বয়েই গেল—যা। থাক দাঁড়িয়ে চিরকাল ঐখানে, আমি চললাম।

বট অশত্থ নিম আরও কত গাছই তো ছিল মেলায়। আম পেয়ারা

কাঁঠাল আরও কত কি। কিন্তু গুল-মোরকেও আমি এনেছিলাম। খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে পেয়েছিলাম এই গুল-মোরকে। গুল-মোরকে কি সহজে পাওয়া যায়!

নীলকুঠির জঙ্গলে কিন্তু বিস্তর গুল-মোর। এক বার গিয়েছিলাম নীলকুঠিটা দেখতে। দূর থেকে মনে হয়েছিল, সারা জঙ্গলটার মাথায় যেন আগুন ধরে গিয়েছে। কাছে পৌঁছে বুঝতে পেরেছিলাম, আগুন জ্বালিয়েছে গুল-মোরেরা। ফুলের আগুন, হলদে আর নীল ফুল ফুটিয়ে গুল-মোরেরা আগুন জ্বালাতে পারে।

জগ্‌মোহন পাগল হয়ে উঠত কোথাও গুল-মোর দেখলে। অন্ততঃ তিনটি দিন সেই গুল-মোরের ছায়ায় থাকা চাই। গ্রাম অনেক দূর, জল নেই, লোকালয় নেই, এক মুঠো ছাতু পর্যন্ত নেই ঝুলিতে। তা হোক, তবু থাকতে হবে। উপোস করেই পড়ে থাকতে হবে গুল-মোরের ছায়ায়। কি পাগ্‌লামো!

তা সেই গুল-মোর দেখলাম নীলকুঠির জঙ্গলে।

তার পর এই গুল-মোরকে রথের মেলা থেকে খুঁজেপেতে নিয়ে এসেছিলাম।

দেখে অনেকে অনেক কথাই বলেছিল। বলবেই, বট অশ্বত্থ নিম অশোক অর্জুন নাগকেশর ছাতিম কত কি রয়েছে। সব ফেলে একটা গুল-মোর! কি পাগ্‌লামো!

হোক পাগ্‌লামো, তবু গুল-মোরই থাকবে আমার আসনের ওপর। বোম্ ভোলে কৈলাসপতির আদেশ, মা ভবানীর ইচ্ছে। এর ওপর কার কি বলবার আছে!

না, বলবার কিছু সাহসই বা হবে কেন কারও! কয়েকটা দিন পরেই বিস্তর খুন পান করে—সেই এতটুকু গুল-মোরই সবাইকে বুঝিয়ে দিলে, বট অশত্থ নিম অশোক থেকে কোন মতেই সে এতটুকু খাটোও নয়। খবরদার, লাগতে যদি আস আমার সঙ্গে কেউ, তা হলে আরও খুন পান করব।

কেউ সাহসও করে নি লাগতে। আর এখন তো দুনিয়া শুদ্ধ সবাই ওর পায়ে মাথা ঠুকছে। যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম।

তা হলে ওঠা যাক এবার। সন্ধ্যা হল, গুল-মোরের আরতির ব্যবস্থা হচ্ছে। আরও যদি পড়ে থাকি, তা হলে গুল-মোর হয়তো আমাকেও ওর এক জন ভক্ত বলে ঠাওরাবে।

হি হি হি হি, এমন হাসি পায় ভাবলে!

হাসি চেপে উঠে পড়লাম। ধুলো মাখা ঝুলিটা কাঁধে তুলে নিয়ে পায়ে পায়ে রাস্তা পার হয়ে সামনের ফুটপাথে উঠে দাঁড়ালাম।

এক ছোকরা দৌড়ে চলে গেল আমার পাশ দিয়ে। রাস্তাটা টপকে গুল-মোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে এক প্যাকেট কর্পূর বার করে বেদীর কিনারায় রেখে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিলে। তার পর সেই কর্পূরের পাশে মাথা ঠুকে দিলে দৌড়। কর্পূরটা জ্বলতেই লাগল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। অনেকেই ছুটতে ছুটতে এল, কর্পূর জ্বালালে, মাথা ঠুকলে আর দিলে দৌড়। বাঃ, বেশ মজা তো। কারা এরা! নেহাত নাবালক ছেলে-মেয়ের দল, ওদের অত ভক্তি উথলে ওঠার মানে? কি কামনা জানিয়ে গেল ওরা ভর সন্ধ্যাবেলা গুল-মোরের কাছে!

একটা বুড়ো বসেছিল কয়েক গাছা ফুলের মালা নিয়ে এধারের ফুট-পাথে। তার কাছে গিয়ে ডালা শুদ্ধ মালা ক-গাছা কিনে ফেললাম। বুড়ো সন্তুষ্ট হল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ গুল-মোরে কোন্ দেবতার পূজা হচ্ছে? এতগুলো কম বয়সের ছেলে-মেয়ে কর্পূর জ্বালিয়ে কার চরণে মাথা ঠুকে গেল?

আশ্চর্য হয়ে গেল বুড়ো। বললে—"তাও জান না! কা তাজ্জব! ঐ তো প্যারী, ঐ তো প্যারী গুল-মোর। এত বড় তীর্থটার নাম জান না! কত দূর দূর থেকে মানুষ আসে ঐ প্যারী গুল-মোরের কাছে। আর ঐ কম বয়েসের ছেলে-মেয়েরাই তো আসবে। মানে, ঐ বয়েসেই

প্রেমে পড়ে কিনা মানুষে। প্রেমে পড়লেই লাগে নটঘটি। তখন প্রাণের দায়ে ছুটে আসে সবাই প্যারী গুল-মোরের কাছে। প্যারী সব গোলমাল মিটিয়ে দেয়। ভারী জাগ্রত দেবতা—ঐ প্যারী গুল-মোর—ভারী জাগ্রত পীঠস্থান।"

বলতে বলতে বুড়ো দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

দাবানল

পণ্ডিত চতুর্ভুর্জ ত্রিবেদীর সত্যিই চারখানা হাত ছিল না, ছিল শাস্ত্র-জ্ঞান। দু-হাতওয়ালা পণ্ডিতের যতটা শাস্ত্রজ্ঞান থাকে, তার দ্বিগুণ পরিমাণ ছিল। সেই অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান অকাতরে তিনি বিতরণ করতেন।

ত্রিবেদী মশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান জানতে যেত লোকে। ভাদ্র মাসে গরু বিয়োলে কি হয়? দাঁত সুদ্ধ ছেলে জন্মালে তার ফল কি? ঘরের চালে শকুন পড়লে ঘরখানা জ্বালিয়ে দিতে হয় না শুধু ভেঙে ফেললেই চলে? শাস্ত্র কি বলে তাই জানতে যেত সকলে। ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে ঠিকুজি মেলাতে যেত, বাপ মা মলে শ্রাদ্ধের ফর্দ করাতে যেত, রোগ হলে শালগ্রামের মাথায় তুলসী চড়াতে যেত। আপদে পড়লে যেত, আনন্দে মাতলে যেত, ত্রিবেদী-বাড়িতে যেতই সকলে। ত্রিবেদী মশায় শাস্ত্রসাগরে ডুব দিয়ে মণিরত্ন উদ্ধার করেছেন। কেন যাবে না লোকে তাঁর কাছে।

সেই ত্রিবেদী-বাড়ি এখনও আছে, লোকে আর এখন সেখানে যায় না। যায় না কারণ ত্রিবেদী-বাড়িতে ত্রিবেদী মশায় নেই এখন, তিনি সপরিবারে সাত পুরুষের বাস্তু ত্যাগ করে প্রস্থান করেছেন। এবং আর কখনও আসল ত্রিবেদী-বাড়িতে আসল ত্রিবেদীরা ফিরবেন না।

বর্তমান ত্রিবেদী-বাড়ি গঙ্গার পশ্চিম কূলে। গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। ত্রিবেদীরা এখন বারাণসী বাসের ফলভোগ করছেন। মস্ত বড় অট্টালিকা গঙ্গা-গর্ভ থেকে সোজা উঠে গেছে, মস্ত মস্ত থামের ওপর অট্টালিকার ছাত, ছাতখানা অনেকটা এগিয়ে এসে ঝুলে পড়েছে গঙ্গার ওপর। সেই নবাবী আমলের তৈরী অট্টালিকা। ত্রিবেদীরা এখন এই নবাবী অট্টালিকায় বাস করেন। ত্রিবেদীরা বাস করেন বটে, লোকে কিন্তু এ বাড়িকে ত্রিবেদী-বাড়ি বলে না। বাড়ির নাম হীরামন্ হাবেলী। কে এক বেগমসাহেবা ছিলেন নবাবী আমলে, তাঁর নাম

নাকি ছিল হীরামন্। তাঁর জন্যে বাড়িখানি বানানো হয়েছিল। বেগম-সাহেবা কোন্ কালে চলে গেছেন দুনিয়া থেকে, তাঁর নামটা বেঁচে আছে। লোকে এখনও ঐ বাড়িখানিকে হীরামন্ বিবির বাড়ি বলে কিংবা শুধু বিবি-বাড়িই বলে। বিবি-বাড়িতে বাস করেন এখন ত্রিবেদীরা, চতুর্ভুর্জ ত্রিবেদী মশায় স্বয়ং বেঁচে রয়েছেন, প্রতিদিন ওঁদের কুলদেবতা অনন্তদেবের মাথায় তুলসী চড়ছে। এখন গঙ্গাজলে চন্দন বাটা হয় অনন্তদেবের জন্যে গঙ্গাজলে ভোগ রান্না হয়। সকাল সন্ধ্যা বিবি-বাড়িতে কাঁসর ঘণ্টা বাজে, তবু লোকে ও বাড়িকে ত্রিবেদী-বাড়ি বলে না। এবং কেউ কোনও বিধান নিতে যায় না।

বিধানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে লোকের, এ কথা বললে অন্যায় বলা হবে। ভাদ্র মাসে এখন গরু বিয়োয় না বা দাঁত নিয়ে ছেলে জন্মায় না, তাও নয়। সবই হয়, আগেকার ত্রিবেদী-বাড়ির আশেপাশে যা যা ঘটত, তাও, এখনকার ত্রিবেদী-বাড়ির তিন দিকেও তাই ঘটে। বিধান নিতে ছোটে লোকে গঙ্গার পুব কূলের টোলে, ত্রিবেদী-বাড়ির দরজা মাড়ায় না। ভয় পায়, ভয়ানক ভয় পায় সকলে চতুর্ভুর্জ ত্রিবেদী মশায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। সবাই জেনে ফেলেছে, ত্রিবেদী মশাই কোনও বিধানের ধার ধারেন না। চাক্ষুষ প্রমাণ—ত্রিবেদী-বাড়ির ছাতে এক পাল শকুন সদা সর্বক্ষণ বসে আছে। জ্যান্ত শকুন সবকটি; একেবারে জলজ্যান্ত শকুন সব। ছেলে বুড়ো আণ্ডা বাচ্চা আস্ত একটা শকুন সংসার বাস করছে বর্তমান ত্রিবেদী-বাড়ির ছাতে। ছাতের ওপর শকুনের সংসার, ছাতের তলায় ত্রিবেদীদের সংসার। কে যাবে এমন ত্রিবেদীদের কাছে বিধান নিতে! ঘরের চালে শকুন পড়লে কি করতে হবে, তা জানবার জন্যে এমন লোকের কাছে কে যাবে যাঁর ঘরের চালে এক পাল শকুন পরম শান্তিতে ঘর গৃহস্থালি করছে!

বারাণসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাস করছেন এখন ত্রিবেদীরা শকুনদের আশ্রয়ে। বাড়িখানি শকুনগুলো সমেতই নিয়েছিলেন

ত্রিবেদী মশাই। নিয়েছিলেন-মানে দাঁও মত পেয়ে গিয়েছিলেন। ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে এই বাড়িখানি পাবার, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসার উপযুক্ত হেতু আছে। সে সব হল সেই সাবেক কালের কথা। তখন ইংরেজরা ছিল এই দেশে, তারা আবার তাদের জ্ঞাতি-গুষ্টির সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছিল তখন। লড়াইটা চলছিল দুনিয়ার অন্য প্রান্তে, তার ছোঁয়াচ এসে পৌঁছে গেল বাঙ্‌লার পূব দিকটায়। ওলট-পালট হয়ে গেল অনেক রকম, জাগ্রত দেব-দেবীর মন্দিরের দরজায় রাতের অন্ধকারে শিঙ্‌ সুদ্ধ গরুর মাথা আবির্ভূত হতে লাগল। মাথা-গুলোই এল শুধু ধড়গুলোর পাত্তা নেই। ধড়ের খোলসটাকে খাবার জলের পুকুরে ভাসতে দেখা গেল। আরও নানা জাতের বিদকুটে বিপত্তি ঘটতে শুরু করল একে একে। মাতৃশ্রাদ্ধে ঘটা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছিলেন চাটুয্যেরা, অনাহূত এক দল অতিথি এসে রৈ রৈ করে বসে পড়ল পঙক্তিতে। কন্যা সম্প্রদান করতে বসেছেন প্রসন্ন বিশ্বাস, গ্রামেরই চেনাজানা ছেলেরা উপস্থিত হল রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে। কন্যাটিকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল সকলের নাকের ডগা থেকে। আরও কত কি! ত্রিবেদী মশাই শাস্ত্র ঘেঁটে দেখলেন, দুর্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। এবং শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—এ-কথাও শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। অতঃপর তিনি আর অপেক্ষা করা সমীচীন জ্ঞান করলেন না। তলে তলে ব্যবস্থা করে সম্পত্তি হস্তান্তর করে ফেললেন। অনেক দূরে গঙ্গার পশ্চিম কূলের এক শিষ্যকে স্মরণ করলেন। শিষ্যটি দুঁদে জাতের উকিল। তাঁর এক মক্কেল কোন এক নামজাদা নবাবের বংশধর সেই সময় ফৌত হয়ে পড়লেন মামলা-মোকদ্দমার প্যাঁচে পড়ে। উকিলবাবুর পরামর্শে তিনি চলে গেলেন বাঙ্‌লার পুবে ত্রিবেদীদের বাস্তুভিটায়। তাঁর বাড়িখানি নিলেন ত্রিবেদীরা। সুশৃঙ্খলে সব কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। উকিলবাবু তাঁর মক্কেলের মঙ্গল করলেন এবং গুরুবংশকে গঙ্গাতীরে স্থাপন করলেন। এক ঢিলে দুই পাখী বধ হল।

তবে এক পাল পাখী বেঁচে রইল বাড়ির ছাতে, এটা একটা উপসর্গ

বটে। রইল থাকুক, খেতে পরতে দিতে হবে না যখন, তখন থাকলে ক্ষতি কি! বাড়ির চালে হঠাৎ একটা বা কয়েকটা শকুন বসলে কি ফল হয়, তাই লেখা আছে শাস্ত্রে। কিন্তু সশকুন বাড়ি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকলে কিছু হয় কি না, তা কোনও শাস্ত্রের কোনও শ্লোকে লেখা নেই। সাত পুরুষের ইষ্টদেবতা অনন্তদেবটিকে গলায় বেঁধে নিরম্বু উপবাস করে সঙ্গে এনেছেন ত্রিবেদী মশাই, নিত্য সেই অনন্তদেবের ওপর তুলসী পড়েছে। যে গৃহে প্রত্যহ শালগ্রামের শিরে তুলসী চড়ে, সে গৃহের শিরে বজ্রাঘাত হলেই বা কি হবে! শকুন তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার! স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়—এই মহা-বাক্যটিও শাস্ত্রে রয়েছে। সুতরাং চিন্তা কি!

চিন্তার কোনও কারণ সত্যিই ছিল না। শাস্ত্র-সম্মত-শকুনগুলোও নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি করছিল। কলুষনাশিনী জননী জাহ্নবী স্বয়ং ওদের সহায়, ওদের অভাব কি!

হীরামন্ হাবেলীর ছাত বুক সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে দু হাত অন্তর একটি থাম, থামের মাথায় নিরেট গম্বুজ। প্রতিটি গম্বুজের মাঝখান থেকে এক হাত উঁচু লোহার শিক একটি খাড়া হয়ে রয়েছে। নবাবী আমলে শিকগুলোর সঙ্গে বোধ হয় নিশান বাঁধা হত। হাল আমলে এক একটি শকুন বসে থাকে প্রত্যেকটি শিক ঘেঁষে। বসে থাকে এমন ভাবে যেন ওরাও চুন-বালির তৈরী, এতটুকু নড়ন চড়ন নাস্তি। নজর কিন্তু ঠিক আছে, গঙ্গার এধারে ওধারে যত দূর দৃষ্টি পৌঁছয় তত দূর পাহারা দিচ্ছে। খাবার মত কিছু ভেসে যেতে দেখলেই এক জন উড়ল। আকাশে একটা চক্কর দিয়ে পৌঁছে গেল ঠিক জায়গায়, ঝপ করে নেমে পড়ল খাবারের ওপর। তার পর টাল সামলে ঠিকঠাক হয়ে বসে মন দিলে খাওয়ায়, খেতে খেতে মহা আরামে ভেসে চলল। আরামটুকু দশ হাতও এগোতে পেল না, এক জনকে উড়তে দেখেই বাকি সবাই গলা উঁচিয়ে দেখে নিলে ব্যাপারটা। তার পর দল বেঁধে ঝাঁপ দিলে গঙ্গায়। গঙ্গার জলে কিন্তু পড়ল না, কয়েক হাত

ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল। ধরে ফেললে ঠিক তাকে, যে মহা আরামে ভেলায় চেপে খেতে খেতে চলেছে। তখন আরম্ভ হল ছোঁ মারা, ছোঁ মেরে এক খাবলা ঠোঁটে নিয়ে আকাশে ওঠে। সেটুকু শেষ হলে আবার ঝাঁপ দেয়। তখন আর কারও পক্ষেই আহার্যের ওপর চড়ে বসে শান্তিতে খাওয়া সম্ভব নয়। এই ভাবে ছোঁ দিতে দিতে খাদ্যের সঙ্গে উধাও হয়ে গেল সবাই, আকাশে জলে কোথাও এক প্রাণীর চিহ্ন নেই। ঘণ্টাখানেক পরে একে একে সবাই ফিরে এসে বসল ত্রিবেদীদের ছাতে। উদর তখন পূর্ণ হয়ে গেছে।

সুতরাং শকুনদের জন্যে ত্রিবেদীদের কানাকড়ি খরচা নেই। তবে ছাত বোঝাই শকুনের জন্যেই বোধ হয় ঐ বাড়িতে চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর কাছে বিধান নেবার জন্যে যেত না কেউ। শকুনরা ত্রিবেদীদের পসার জমতে দিলে না।

কত কাণ্ডই না ঘটল তার পর। সে বছর পুজার আগে মস্ত বড় ঝড় বৃষ্টি হল। গঙ্গার জল বেড়ে ত্রিবেদী বাড়ির আঙ্গিনায় ঢুকে পড়ল। হাজার হাজার মড়া ভেসে চলেছে গঙ্গা দিয়ে, তাদের মধ্যে জনকয়েক এসে তাঁদের আঙ্গিনায় আশ্রয় নিলে। দুর্গন্ধে প্রাণ যাবার উপক্রম হয়ে উঠল। ছাত থেকে উঠোনে নামল শকুনরা, দু দিনের ভেতর উঠোন পরিষ্কার করে দিলে। ওধারে চাল উঠল টাকায় এক সের। মন মন কাঁসা পেতলের বাসন নৌকা বোঝাই করে নিয়ে এসেছিলেন ত্রিবেদীরা দেশ থেকে, সেগুলো একে একে কমতে লাগল। বিস্তর মানুষ দিবা রাত্র অষ্ট প্রহর দরজায় দরজায় চেঁচাতে লাগল—একটু ফেন দাও গো মা। হাহাকারের জ্বালায় ইংরেজ আর এ দেশে তিষ্ঠোতে পারল না। বাঙলার পুব দিকটাকে মক্কা মদিনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তল্পি গোটালে। ফলে শাস্ত্র মেনে চলবার আশায় রাশি রাশি গৃহস্থ পুব দিক ছেড়ে পশ্চিমে চলে এসে পথের ওপর আশ্রয় নিলে। শাস্ত্র যা করতে পারলে না, পথ তাই করলে। পথ তাদের বেমালুম গ্রাস করে ফেলে

ধর্ম নষ্টের দায় থেকে বাঁচালে। ত্রিবেদীদের মত সময় বুঝে গুছিয়ে চলে আসতে পারলে টিকে যেত হয়তো অনেকে। কিন্তু সময়ের সংকেত ধরতে পারে ক-জনে! সব মানুষই তো আর চতুর্ভুর্জ ত্রিবেদী মহাশয়ের মত শাস্ত্র-সমুদ্রের ডাঁটো ডুবুরী নন।

টিকে রইলেন চতুর্ভুর্জ ত্রিবেদী মশায়, সময়ের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন সব সময়। ঐ প্রস্তুত হয়ে থাকাটা হঠাৎ শুরু হয়ে গেল এক-দিন। সেই পূজার সময়ের বন্যাতেই প্রকাণ্ড এক বেলগাছ গঙ্গা দিয়ে এসে আটকে গেল ত্রিবেদী-বাড়ির ঘাটে। ঘাট সরতে হলে গাছ সরাতে হয়। বন্যা কমতে লোক জন ডেকে গাছটাকে টুকরো করাতে হল। এক-মিলওয়ালা এসে কয়েক নৌকো কাঠ নিয়ে গেল। বেল কাঠ জ্বালিয়ে তারা মিল চালাবে। কয়েকটা মসৃণ সরল টুকরো রেখে দিলেন ত্রিবেদী মশাই, প্রত্যেকটি প্রায় আড়াই হাত লম্বা বেড়ও হাত দেড়েকের মত হবে। বললেন—জ্যান্ত বেল গাছের গায়ে কোপ দিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠে যজ্ঞ করলে মহাপাতক হয়। শিষ্য যজমানদের জন্যে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করার দরকার হলে শাস্ত্র-সম্মত কাঠ সংগ্রহ করার জন্যে আর ছুটে বেড়াতে হবে না। কাঠের দুর্ভাবনা ঘুচল।

দুর্ভাবনা কিন্তু ঘুচল না বরং ঘোরতর রকম বৃদ্ধি পেল বলা চলে। ত্রিবেদী মশায়ের নয়, বাড়ির অন্য সব প্রাণীর। ত্রিবেদী মশায়ের কাণ্ড-কারখানা দেখেই বেড়ে গেল সকলের দুর্ভাবনাটা। তিনি কাঠ ক-খানিকে তুলিয়ে আনালেন দোতলায়, আনিয়ে তাঁর শোবার ঘরের এক কোণে পরিপাটী করে সাজিয়ে রাখলেন। বেল কাঠের ওজন কম নয়, অন্ততঃ চার-পাঁচ মণ তো হবেই। সেই রাশীকৃত কাঠকে শোবার ঘরে স্থান দেওয়াতে বহু রকমের আপত্তি উঠল। ত্রিবেদী মশায়ের ভায়েরা যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হলেন। কারও আপত্তিতে কান দিলেন না ত্রিবেদী মশাই, সময় বুঝে সামলে চলাটা তাঁর ধাতস্থ। পাঁচ মণ কাঠ শোবার ঘরে সাজিয়ে রেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গঙ্গাতীরে বাস করতে

লাগলেন তিনি, এক পাল শকুনও তাঁর শিয়রের ওপর নির্বিঘ্নে বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল।

বেল কাঠের পরে এল চন্দন কাঠ। আড়াই হাত লম্বা দেড় হাত বেড়ের চন্দন কাঠ একখানিও মিলল না। দু সের আড়াই সের ওজনের টুকরো পঁচিশটা সংগ্রহ করা গেল। বিনা পয়সাতেই জুটে গেল সেগুলো। বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে পত্র দেবার সময় প্রত্যেকটি শিষ্যকে জানিয়ে দিলেন ত্রিবেদী মশাই, অনন্তদেবের জন্মে উৎকৃষ্ট চন্দন কাঠ একখানি পাঠাতে হবে। শিষ্যরা গুরুদেবের এই সামান্ত আদেশ সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করলেন। বাজার ঢুঁড়ে আসল মৈসুরী চন্দন কিনে গুরুদেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

চন্দন কাঠগুলিও বেলকাঠের পাশে শোবার ঘরে স্থান পেল।

তখন পর্যন্ত কেউ ধরতেই পারল না ত্রিবেদী মশায়ের মতলবটুকু। তার পর অবশ্য কিছুই আর বুঝতে বাকী রইল না। ষোড়শোপচার সংগ্রহ হতে লাগল একে একে। এল একখানি নেয়ারের খাট, সেখানি পাতা হল না, টাঙানো রইল দেওয়ালের গায়ে। বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত এল এক টিন, টিনের মুখ এমন ভাবে বন্ধ করা যাতে হাওয়া না ঢোকে ভেতরে। টিনটি আশ্রয় পেলে দেওয়াল-আলমারির নীচের থাকে। সেই আলমারির অন্য থাকগুলো বোঝাই হতে লাগল ছোট বড় বয়েম দিয়ে। কোনটায় সের দুই ধুনো, কোনটায় আধ সের গুগগুল, কোনটায় ঝাড়া বাছা আতপ চাল এক সের, তার পর এল কর্পূর, আতর, তিল, কয়েক খণ্ড সুবর্ণ, কুশ এক গোছা। সমস্ত থরে থরে সাজানো রইল কাঁচের বয়েমে। এল পাঁচটা মাটির কলসী, এক গোছা পাট কাঠি, দু খানা মালসা, নতুন গামছা, নতুন থান-ধুতি কয়েক জোড়া। সমস্ত জিনিস মিলিয়ে গুছিয়ে সামলে রাখলেন মনের মত করে ত্রিবেদী মশাই, কোনও খানে এতটুকু ত্রুটী রাখলেন না। দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেল সবাই—হাঁ সাধক মানুষ বটে। সাধক না হলে নিজের মরণের জন্মে এ ভাবে কেউ প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে!

ত্রিবেদী মশায়ের ভায়েরা কিন্তু সাবাস দিতে পারল না, তারা স্তম্ভিত হয়ে রইল। বড় ভাইকে তারা বড় ভায়ের চেয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিল। উঁচুতে স্থান দিয়েছিল বললে ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যাবে না, বলা যায় বড় ভাইকে তারা প্রায় মায়ের মত দেখত। মায়ের স্থানটিই দখল করেছিলেন ত্রিবেদী মশায়, ভায়েদের বুঝতে দেন নি মায়ের অভাব। ভায়েদের স্নান করিয়ে দিয়েছেন, জামা-কাপড় পরিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছেন, পাশে নিয়ে শুয়ে ঘুম পাড়িয়েছেন। লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরি-বাকরি করে দিয়ে বিয়ে-থা দিয়েছেন। ভায়েরা দাদা ছাড়া আর কিছুই জানত না। দাদার কাছে তাদের লুকোবার ছিল না কিছু। দু ভাই বিদেশে চাকরি করত। ছুটি নিয়ে ছুটে আসত তারা দাদার কাছে, এসে দাদার পাশে ঘুমিয়ে যেত কয়েক দিন। সেই দাদা যখন মরবার জন্য তৈরী হয়ে বসলেন হঠাৎ, তখন তারা বোবা বনে গেল। বলবার কি আছে! বললেই বা শুনছে কে! জীবনে বিয়ে করলেন না, সংসারী হলেন না যিনি ভায়েদের মানুষ করবার জন্যে, তাঁর কাছে ভায়েদের সব মান অভিমান রাগ দুঃখ অরণ্যে রোদন হয়ে দাঁড়াল। চতুর্ভুজ ত্রিবেদী নিঃশব্দে হেসে ভায়েদের অভয় দিলেন—না রে পাগলারা, মরছি না আমি এখনই। কিন্তু তৈরী হয়ে থাকতে আপত্তি কোথায়?

বাস্তবিকই কারও জানার উপায় নেই, মরণ কবে আসবে কি ভাবে আসবে। মরণের কথা থাক, এই যে চোখের দৃষ্টিটুকু, যার সাহায্যে দুনিয়ার বুকে দুনিয়াখানাকে চিনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই দেখে চেনবার শক্তিটুকুও যে কবে কোন্ মুহূর্তে হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে তা কে বলতে পারে। বেঁচে আছি, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছি যা কিছু পড়ছে চোখের আওতায়, দেখে বিবেচনা করে পা ফেলছি। হঠাৎ এক দিন তাকানো ফুরিয়ে গেল, দেখা ফুরিয়ে গেল, সম্বন্ধ ঘুচে গেল দুনিয়ার সঙ্গে। চোখের কাজ আর করছে না তখন চোখ দুটো, বেমালুম অন্ধকার। আলো নিভে গেছে দুনিয়ার বুক থেকে, দুনিয়াখানা চোখের

সামনে থেকে উঠে গেছে। এরই নাম কি মরণ নয়! এই জাতের মরণে মরে তার পরও যদি শ্বাস-প্রশ্বাস বজায় থাকে, তখন কেমন হয়! বেল কাঠ চন্দন কাঠ গাওয়া ঘি কাজে লাগে না বটে, কিন্তু কাঠগুলো বিনা আগুনে গুমিয়ে গুমিয়ে জ্বলতে থাকে। আর সেই বিনা আগুনের জ্বলন্ত চিতার ওপর বসে তখন দিন গুণতে হয়। ধোঁয়া থাকলেই আগুন আছে, এটা যদি সত্যি কথা হয়, তা হলে আরও বড় সত্যি কথা হচ্ছে, কাঠেও আগুন আছে। বিশ্বাস না হয়, কাঠে কাঠে ঘষে দেখ।

শুকনো কাঠ রাশীকৃত জুটিয়ে নিয়ে বসে থাকাটা সত্যিই খুব নিরাপদ নয়।

ত্রিবেদী মশায়ের পক্ষেও নয়। কাঠ জ্বলতে কতক্ষণ?

কাঠ জ্বলল।

আগুনের মত ক্রমেই ছড়াতে লাগল ত্রিবেদী বাড়ির নাম। পণ্ডিত চতুর্ভুজ ত্রিবেদীকে এইবার চিনে ফেলল গঙ্গার পশ্চিম কূলের মানুষে। ত্রিবেদীরা যে বাড়িতে বাস করেন, সে বাড়িটার নাম ত্রিবেদী-বাড়ি, হীরামন হাবেলী নয়। ত্রিবেদীর কাছে হীরামন বিবি হার মানলেন। মানতেই হবে। কারণ অসার সংসারে সার কতটুকু, তা শুধু জানেন পণ্ডিত চতুর্ভুজ ত্রিবেদী। শাস্ত্রজ্ঞান বহু মানুষেরই আছে, কিন্তু দেখাও তো দেখি আর একটি মানুষ, যিনি ত্রিবেদী মশায়ের মত মরণকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছেন। শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে কিছুই হয় না, সাধনা চাই সত্যোপলব্ধি চাই। অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করা চাই। সিদ্ধিলাভ করে সাক্ষাৎ শিব হয়ে পড়েছেন ত্রিবেদী মশাই, চিরস্থায়ী আনন্দ সাগরে ডুবে আছেন। মৃত্যু ওঁর করতে পারে কি!

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করার বাসনায় ভেঙে পড়ল মানুষ ত্রিবেদী-বাড়ির দরজায়। সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করল সাক্ষাৎ শিব ত্রিবেদী মশায়ের, শ্রীমুখের বাণী শুনে কৃতার্থ হয়ে ফিরে

গিয়ে এমন সব কথা রটাতে লাগল যে আরও মানুষ ছুটে আসতে বাধ্য হল ত্রিবেদী-বাড়ির দরজায়। যাকে বলে, জমজমাট কাণ্ড। ছোটখাটো মেলাই বসে গেল একটা। গঙ্গার পুব পাড়ের টোল কানা হয়ে গেল।

শেষে একদিন ত্রিবেদী মশায়ও কানা হয়ে গেলেন। অনিত্য সংসারটাকে দেখবার জন্যে যে দুটো অনিত্য চক্ষু ছিল তাঁর কপালের ওপর, সে দুটোকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এলেন। অন্তরের দৃষ্টি যাঁর খুলে গেছে, তিনি বাইরের দৃষ্টি নিয়ে কি করবেন!

ব্যাপারটা ঘটে গেল অকস্মাৎ, ভারী আশ্চর্য ভাবে ঘটে গেল ব্যাপারটা। গঙ্গায় ডুব দিয়ে বুক-জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের পানে তাকিয়ে আঁজলা ভরে জল নিয়ে অর্ঘ্যদান করছিলেন ত্রিবেদী মশাই, হঠাৎ থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন সূর্যদেব। কিছুক্ষণ কাঁপবার পরে বনবন করে পাক খেতে লাগলেন। লাল নীল সবুজ বেগুনী নানা জাতের রং ছিটকে পড়তে লাগল আকাশময়। রঙে রঙে রঙীন হয়ে উঠল সমস্ত সৃষ্টিটা, হতজ্ঞান হয়ে তাকিয়ে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, শুধু তাকিয়েই রইলেন। জানতেও পারলেন না, তাঁর চোখ দুটি গলে জল হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল বুক বেয়ে। কি করে জানতে পারবেন! অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে অনাস্বাদিত আনন্দে তলিয়ে আছেন যে তখন তিনি। বাহ্যজ্ঞান কি আছে তখন যে কিছু বুঝতে পারবেন।

তার পর এক সময় টের পেলেন, সব রকমের রঙ্ মিলে মিশে একাকার হয়ে কালো হয়ে গেল। শুধু কালো আর কালো, কালোর মধ্যে তলিয়ে গেলেন সূর্যদেব, তার সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল বিশ্বচরাচর। ত্রিবেদী মশায় দু হাত সামনে মেলে অন্ধ মানুষের মত ফিরে এলেন নিজের ঘরে। কাঠগুলো তাঁর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। তিনি কাঠগুলোর দিকে তাকাতে পারলেন না।

ডাক্তার এল বদ্যি এল, ভায়েরা ত্রুটি রাখলে না দেখাতে শোনাতে। রৈ রৈ করে ছুটে এল ভক্তরা, সূর্যের পানে তাকিয়ে সূর্য-দেবকে অর্ঘ্য দিয়েছেন নিজের চক্ষু দুটিকে ত্রিবেদী মশাই। ত্রিবেদী

মশাইকে দর্শন করে নিজেদের চক্ষু সার্থক করে ফিরে গেলেন ভক্তরা। ত্রিবেদী মশাই একদম অন্ধ হয়ে গেলেন।

যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকুও হল। চতুর্ভুজ ত্রিবেদী সংসারমুক্ত পুরুষ হয়ে বেঁচে রইলেন। ঘি আর কাঠ মুক্ত পুরুষের ঘরে জেগে রইল। কাঠে আগুন আছে, এবং আগুনের কাছে ঘি রাখতে নেই, এই সহজ সত্যি কথাটা কিন্তু তাঁর খেয়ালে এল না। এলেই বা তখন করেন কি তিনি! নজর তো আর রাখতে পারেন না চতুর্দিকে। নজর রয়েছে নিজের বুকের মধ্যে। সেখানে যা দেখতে পাচ্ছেন তাতেই তিনি আনন্দে ডুবে রইলেন।

আগুন গনগনিয়ে উঠল।

আগুনটা হল মুক্তার আগুন, যে আগুনে মুক্তা ভস্ম হয় সেই আগুন জ্বলে উঠল হঠাৎ। ত্রিবেদী মশায় মুক্তা ভস্ম করলেন। অথবা একথাও বলা যায়, মুক্তাভস্ম সেবন করে ত্রিবেদী মশাই জরা জয় করে ফেললেন।

এ ব্যাপারটা ঘটল অকস্মাৎ।

মুক্তা এল ছোট ভায়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে। সে হল ত্রিবেদী মশায়ের ছোট ভায়ের বউয়ের কি রকম এক সম্পর্কের দিদি। বয়স, তা ত্রিশের কাছাকাছি হবেই। বড়ই মর্মস্পর্শী ইতিহাস তার। বিয়ে হয়েছিল, স্বামী রেলে চাকরি করত। চাঁদপুর থেকে যে লাইনটা চলে গেছে আখাউড়ার দিকে,—সেই লাইনের কোনও স্টেশনে টরে-টক্কার কল ঠুকত। কোয়ার্টার পেলে বউ নিয়ে যাবে, এই আশায় ছিল। হঠাৎ এক দিন বিস্তর লোক দা টাঙি নিয়ে ঢুকে পড়ল স্টেশনে। মাস্টার বাবু, টরেটক্কা বাবু, টিকিট বাবু মায় যে লোকটা ঘণ্টা বাজাত গাড়ি ছাড়বার সময়, সকলকে কুপিয়ে কেটে রেখে চলে গেল তারা। যাবার সময় মাস্টার বাবু আর টিকিট বাবুর কোয়ার্টার থেকে তাঁদের বউ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গেল। টরেটক্কা বাবুর নতুন বিয়ে করা

পরিবার বাপের বাড়ি ছিল, তাই রক্ষা পেলে। রক্ষা পেয়ে বাপ ভায়ের একদা পুব দিক ছেড়ে পশ্চিমে চলে এল। বাপ ভাই তখন নিজেদেরই সামলাতে পারে না। অগত্যা তাকে নিজের ভার নিজে নেবার জন্যে তৈরী হতে হল।

তৈরী হয়েই ছিল যেন সব ব্যবস্থা তার জন্যে। দূর সম্পর্কের বোনের ভাসুর অন্ধ। মস্ত বড় পণ্ডিত, আজন্ম ব্রহ্মচারী দেবতুল্য ব্যক্তি। তাঁর সেবায় নিযুক্ত হল মুক্তা। ত্রিবেদী মশাইকে হাতে ধরে এ ঘর থেকে ও ঘরে নিয়ে বেড়াতে লাগল। পূজার যোগাড় করে দেওয়া, জলের গেলাসটা হাতে তুলে দেওয়া, কাপড় গামছা গুছিয়ে দেওয়া, হাত ধরে পাতের সামনে আসনে বসানো, তার পর খাওয়া হলে হাতে জল ঢেলে পা ধুইয়ে দিয়ে খাটের ওপর তুলে দেওয়া, এ সমস্ত কে করে। ছোট ভায়ের বউটি শুধু আছে সংসারে, সে তো আর ভাসুর ঠাকুরকে ছুঁতে পারে না। ভাই উদয় অস্ত চাকরি করে, বাড়িতে থাকে কতক্ষণ। কে হবে অন্ধের যষ্টি, মুক্তাকে এনে সংসারে আশ্রয় দিতে হল।

ত্রিবেদী মশাই আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। মুক্তার চক্ষু দুটির সাহায্যে তিনি সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তুললেন। মুক্তা তাকে দুনিয়াখানা সম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌হাল রাখতে লাগল।

ভারি মজা, ত্রিবেদী মশাই ভারি মজা পেতে লাগলেন। মুক্তা যা দেখে, যেমন ভাবে দেখে, দেখে যা বোঝে, যেমন করে বোঝে, তাই শোনায় ত্রিবেদী মশাইকে। শোনাবার মত কথাও শোনায়, না শোনাবার মত ব্যাপারও শোনায়। ক্রমে ক্রমে সাহস বাড়তে লাগল মুক্তার, বাড়াই স্বাভাবিক। তার ওপর একান্তনির্ভর অন্ধ মানুষটিকে সে ওঠাবার দরকার হলে ওঠায়, বসবার দরকার হলে বসায়। তা ছাড়া আরও একটি গুণ আছে মুক্তার, বাঙ্‌লা সে খুব সুন্দর করে পড়তে পারে। সংবাদপত্র পড়ে শোনায়, মাঝে মাঝে বই-টইও। শাস্ত্র পড়তে পারে না, শাস্ত্র ছাড়া পড়বার বস্তুর অভাব নেই দুনিয়ায়।

এতকাল অবশ্য ত্রিবেদী মশাই শুধু শাস্ত্রই পড়েছেন, এবার অনেক কিছু পড়তে লাগলেন মুক্তার চোখ দিয়ে। মুক্তার গলায় সদাসর্বদা একটা হাসির আমেজ, একটা হালকা গোছের সুর, একটা বেপরোয়া ভাব। মুক্তা পড়ে, ত্রিবেদী মশাই শোনেন। এত রকমের এত বিষয় যে লেখা হয়েছে, এবং তা যে পড়া যায়, পড়লে শুনতে ভাল লাগে, এ যে বড় আশ্চর্য কাণ্ড! দৃষ্টি হারিয়ে দৃষ্টি খুলে যেতে লাগল ত্রিবেদী মশায়ের, তিনি একটু অন্য রকম ভাবে বেঁচে থাকার স্বাদটা পেতে লাগলেন। ভারি মজা!

সেদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরের কাজ সমাপ্ত করে ওপরে উঠে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। নিজে নিজেই উঠে গেলেন, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করবার সময়ে আর হাত ধরতে হয় না তাঁর, তবে পিছনে থাকতে হয়। মুক্তা ওঁর পিছনে আছেই। ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন আসনে, আসনখানি পাতা ছিল মেঝেয়। সন্ধ্যার আগেই পেতে রেখেছিল মুক্তা, ত্রিবেদী মশাই জলযোগ করবেন। রাত্রে তিনি একটু দুধ আর সামান্য মিষ্টি খান, সন্ধ্যার পরেই খান। তার পর ঐ আসনে বসেই গল্প শোনেন মুক্তার মুখ থেকে। আগে শুয়ে পড়তেন এখন আর শোন না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন আর গল্প শোনেন।

খাওয়া শেষ হতে হাতে জল দিয়ে যত্ন করে হাত পা মুছিয়ে দিলে মুক্তা। এলাচ লবঙ্গ হাতে দিলে। তার পর একটা নতুন জাতের প্রস্তাব উত্থাপন করে বসল।

নিন, এবার বিছানায় গিয়ে উঠুন। মশারিটা ফেলে দিয়ে যাই আমি।

চমকে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই, বেশ একটু থতমত খেয়ে গেলেন যেন। বললেন—যাবে! মানে—এখনই চলে যাবে!

মুক্তা বললে—আর বলেন কেন ঝঞ্ঝাটের কথা। টিকিট পর্যন্ত কিনে এনেছেন একেবারে। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে টিকিট

এনে ফেললেন, এখন যদি না যাই, তা হলে ভাববেন কি !

ত্রিবেদী মশাই ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন—টিকিট ! কিসের টিকিট ? কে কিনে এনেছে ?

মুক্তার গলায় কপট ক্রোধ ঝলঝলিয়ে উঠল—কে আবার অমন কর্ম করবে, টিকিট এনেছেন ঐ বিপুলবাবু, যাঁকে আপনি ব্রহ্মচারী বলে ডাকেন। ব্রহ্মচারী হলে হবে কি, সিনেমা দেখার শখ যথেষ্ট। একটি সিনেমা বাদ পড়ে না। এমন নেশা যে নিজের পয়সা খরচা করে অপরকেও দেখানো চাই। হঠাৎ এসে বললেন, আমাদেরও টিকিট নিয়ে এসেছেন। ভয়ানক ভাল ছবি এসেছে নাকি। এমন ছবি যে না দেখলে জন্মটাই বৃথা। ছোট বাবু ছোট বউ আর আমি, আমাদেরও যেতে হবে। কি জুলুম দেখুন—

বলতে বলতে থালা গেলাস তুলে নিয়ে চলে গেল মুক্তা। ত্রিবেদী মশাই চুপ করে বসে রইলেন। বসে থাকাটাও খুব বেশীক্ষণ হল না। মনে পড়ে গেল, মুক্তা ফিরে আসবে এখনই, এসে তাঁর মশারি ফেলে দিয়ে বিছানার তলায় গুঁজে দেবে। থালা গেলাস রেখে ফিরে এসে যদি দেখে, তখনও তিনি বসে আছেন, তা হলে ভাববে কি ! উঠে পড়লেন ত্রিবেদী মশাই, খাটের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একটু। কি বিপদ দেখ—সন্ধ্যাবেলাই মশারির ভেতর ঢুকতে হবে ! কেন— তিনি কি নিজেই মশারিটা ফেলে নিতে পারবেন না !

মশারিটা এখন না ফেললেই বা ক্ষতি কি !

মশারির ভেতর শুয়ে এই সন্ধ্যা থেকে ঘুমোবেন নাকি তিনি ! ঘুমোতে পারবেন ?

বিছানার ধারে পা ঝুলিয়ে বসলেন ত্রিবেদী মশাই। আসুক মুক্তা, বলে দেবেন তাকে, মশারি ফেলবার দরকার নেই। নিজেই তিনি মশারি ফেলে নিতে পারবেন। কিংবা সিনেমা দেখে ফিরে এসে সেই না হয় ফেলে দেবে। দরজা তো খোলাই থাকে, দৃষ্টি যাওয়ার পর থেকে দরজা বন্ধ করেন না তিনি। তাতে অন্য সকলের তাঁর ওপর

রাখার সুবিধা। রাত্রে যদি কারও দরকার হয় তাঁর কাছে আসবার, মানে—তাঁর যদি কিছু দরকার পড়ে, তা হলে ডাক দিলেই কেউ না কেউ আসবে। মুক্তাই আসে, মুক্তা তাঁর পাশের ঘরে শোয়। যদি তাঁর ডাকবার দরকার পড়ে রাত্রে তাই মুক্তার স্থান হয়েছে পাশের ঘরে। কিন্তু কোনও দিনই সে দরকার পড়ে না ত্রিবেদী মশায়ের, কাজেই ডাকেনও না।

রাত্রে দরকার না পড়লেও এই সময়টা, সন্ধ্যার পরে এই সময়টুকু কাটাবার জন্যে দরকার পড়ে মুক্তাকে। সন্ধ্যারতি শেষ করে এসে জলযোগ সমাপ্ত করে যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়েন ত্রিবেদী মশাই, ততক্ষণ দূরে বসে গল্প করে মুক্তা। বইটইও পড়ে শোনায়। তা চলল সিনেমা দেখতে। আসুখ দেখে, ত্রিবেদী মশাই কাল গল্প শুনবেন। কি নিয়ে সিনেমা হয়, তাই না শোনা যাবে। সিনেমা ব্যাপারটা কেমন, তা কখনও দেখা হয় নি তাঁর, আর হবেও না ইহ জীবনে। মুক্তার মুখে শুনে যতটুকু জ্ঞান হয় সিনেমা সম্বন্ধে, ততটুকুই বা মন্দ কি! আর কেউ তো তাঁর সামনে বসে সিনেমার গল্প করবে না।

মুক্তা ফিরে এল। ঘরে পা দিয়েই বলল—কি বসে আছেন যে! শুয়ে পড়ুন, মশারিটা ফেলে দি।

ত্রিবেদী মশাই বললেন—থাক না এখন। ফিরে এসেই ফেলে দিও। এখনই কি মানুষ ঘুমোতে পারে।

বাঃ, তা বলে একলাটি এই ভাবে বসে থাকবেন! মুক্তার গলায় একটু যেন বিষাদের সুর ধরা পড়ল।

ত্রিবেদী মশাই টের পেলেন সেটুকু, কিন্তু ধরা দিলেন না নিজে। খুবই দরাজ গলায় বললেন—থাকি না একটু বসে। বসে বসে তোমার কথা মানে তোমার সিনেমা দেখার কথা ভাবব। ফিরে এসে শোনাবে, কি দেখে এলে। যাও, তোমার জন্যে হয়ত ওদের দেরী হয়ে যাবে।

মুক্তা বলল—আমার কিন্তু একটুও ইচ্ছে করছে না যেতে—কি মুশকিলেই যে পড়েছি! দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে সেই

এগারটা। আচ্ছা, এসেই না হয় ফেলে দোব মশারি।

দরজা ভেজাবার শব্দ শুনতে পেলেন ত্রিবেদী মশাই, তাঁর মুখে তখন ফ্যাকাশে এক ফালি হাসি ফুটে উঠেছে।

বসেই রইলেন।

খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসেই রইলেন ত্রিবেদী মশাই, তাঁর রক্ত-বর্ণ শূন্য আঁখি-গহ্বর দুটিতে বিচিত্র ধরনের শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল। সে দৃষ্টিতে বাইরের কিছুই ধরা পড়ল না, অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছল সেই দৃষ্টি, নিজের ভেতরটা তিনি ভয়ানক স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন, আর একজন চতুর্ভুজ ত্রিবেদী কখন কোন্ ফাঁকে তাঁর বুকের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সে লোকটার মুখখানায় হাসি নেই, চাপা অভিমানে সেই মুখখানা থমথম করছে। ত্রিবেদী মশাই কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। ঠিক খুঁজে পেলেন না, সেই আর এক জন চতুর্ভুজের অভিমানের কারণটা। কার ওপর অভিমান তাও ঠিক ধরতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, বিষম রকম ঠকে গেছেন তিনি, নিজের কাছে নিজে গোবেড়েন পিটুনি খেয়েছেন। খেয়ে মুখ আর তুলতে পাচ্ছেন না।

কেন তিনি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর মুক্তাকে সামনে বসিয়ে রাখেন? কেন এ কথা সে কথা আলাপ করেন মুক্তার সঙ্গে? কেন তাকে এতটা আশকারা দিয়েছেন তিনি? কই—কেউ তো কখনও তাঁর সামনে বসে বসে অত বকবক করার সাহস পায় না। আর হাসি —আওয়াজ করে হাসেই বা কে তাঁর সামনে?

তিনি নিজেই বা কার সামনে কবে আওয়াজ করে হেসেছেন?

চভুর্ভুজ ত্রিবেদী কবে কার সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করেছেন? কে কবে তাঁর কাছে বাজে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে? পুরো একটা বছর হতে চলল, মুক্তা এসেছে। মুক্তার আসবার পরে অন্য সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে। মুক্তার হাতে তাঁর ভার সঁপে দিয়ে ভায়েরা বর্তে

গেছে। আগে ছোট ভাইটা আপিস থেকে ফিরে তাঁর কাছে এসে বসত। এখন বসে না। দিনের পর দিন আসেই না তাঁর কাছে, আসলেও তিনি টের পান না। মুক্তা আছে, মুক্তা সব সময়টুকু দখল করে আছে। এসেই বা করবে কি ভাইটি? কথা বলবার তো সুযোগ পায় না।

এবং তিনিও ভুলে থাকেন, মজে থাকেন মুক্তার সঙ্গে গল্প করায়। একটু খেয়ালও করেন না, অপরে কি ভাবলে। কে কি ভাবছে!

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই—কে কি ভাবছে!

আন্দাজ করতে গিয়ে আর একটু ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। আর একটি ধারাল জিজ্ঞাসা উদয় হল তাঁর মনে—মুক্তাই বা কি ভাবছে!

এই সর্বশেষ শাণিত প্রশ্নটাই চিরে চিরে কাটতে লাগল তাঁর মনখানাকে, এবং তার পর তিনি কখন যে মুক্তার চিন্তাতেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তো নিজেই টের পেলেন না।

মনে মনে মুক্তার একটা আবছায়া গোছের মূর্তি ঠিক করে নিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই। একটি বেঁটে-খাটো মানুষ, একটু মাজা রঙ। আর গড়নটুকুও নেহাত হাড়গোড় বার করা নয়। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, মুক্তার চুল কি রকম, তা তিনি একদম আন্দাজই করে ফেলেছিলেন। অপর্যাপ্ত চুল ফেঁপে ফুলে মেঘের মত ঢেউ তুলেছে, চুলের ঢল নেমেছে পিঠে। পিঠ ছাপিয়ে কোমর ছাড়িয়ে পৌঁছেছে চুলের রাশি পায়ের গোছ পর্যন্ত। পথ হারিয়ে ফেলতেন ত্রিবেদী মশাই সেই চুলের অরণ্যে, ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়তেন চুলের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে। তখন স্পষ্ট দেখতে পেতেন তাঁর মনগড়া মুক্তার মনোময়ী আঁখি দুটিকে। যে কথা তলিয়ে আছে সেই আঁখি দুটির অতল গহ্বরে, তা যেন তিনি স্পষ্ট ধরতে পারতেন। বুকের ভেতরটা তাঁর মুচড়ে উঠত। আহা বেচারী, কি নিরুপায়! তাঁর মতই একান্ত নিরুপায়। তাঁর গেছে দেখবার শক্তি, তাই জগৎটা তাঁর নিবিড় আঁধারে ভরে গেছে। মুক্তার দেখবার

শক্তি কিন্তু যায় নি, তবু আমৃত্যু কোনও দিকে কোথাও এতটুকু আলোর ছিটে দেখবার অধিকার নেই ওর। ওর জীবনেও সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে গেছে। হায় হতভাগী—

হায় হতভাগী! পেয়ে বসেছিল ত্রিবেদী মশাইকে খুবই করুণ রসের অমায়িক সহৃদয়তায়। মুক্তার বুকের মধ্যে কি জাতের বোবা বেদনা কাঁদে, তা এক মাত্র তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে! আশ্রয়টুকু যখন পেয়েছে বরাত জোরে, তখন একটু সদয় ব্যবহার পেতেই বা বাধা কি! হতভাগীর সঙ্গে পাষাণের মত ব্যবহার করে লাভই বা হবে কত-টুকু! তা ছাড়া কুটুমের মেয়ে সজাতি স-ঘর, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কখনও! সব চেয়ে বড় কথা, মুক্তার মত এক জনের হাতে নিজের ভারটা তুলে দিতে পেরেছেন, এটা তাঁর একান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে। অষ্টপ্রহর যার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তার সঙ্গে নীচু দরের ব্যবহার করবেন, এতটা ছোট নিশ্চয়ই চতুর্ভুজ ত্রিবেদী নন।

কৃপা অনুকম্পা দিয়ে তৈরী মস্ত একটা ফানুস উড়ছিল ত্রিবেদী মশায়ের মন-আকাশে। ফানুসের তলায় ভারি মিষ্টি চোখ জুড়নো একটু আলো জ্বলছিল। হঠাৎ উলটো টানের হাওয়া লেগে ফানুসটা এক ধারে একটু হেলে পড়ল, আগুন লেগে গেল কৃপা-আবরণে, ত্রিবেদী মশাই মনে মনে একটি আছাড় খেলেন। বসে বসে ভাবতে লাগলেন, কৃপাটুকু আসল না মেকী। কৃপা বা অনুকম্পা কে পাচ্ছে আর কে দিচ্ছে, এটা একটা সমস্যা বটে!

কোনও সমস্যাই সময়ের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে পারে না। সমস্যা দাঁড়িয়ে থাকে, সময় এগিয়ে যায়। ত্রিবেদী মশায়ের সময়ও এগিয়ে চলল। সিনেমা থেকে সে রাত্রে কখন ফিরে এল মুক্তা, তা তিনি টেরও পেলেন না। ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল তখন বুঝতে পারলেন মশারির মধ্যেই শুয়ে আছেন। মশারিটা যে নিজে ফেলেন

নি, এটাও খুব ভাল করে খেয়াল হল তাঁর। তাই ঘুম ভাঙ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে মনটা খুবই হালকা বোধ হল। হিসেব করে বেশ একটা মিষ্টি জাতের তৃপ্তি চাখতে লাগলেন। সিনেমা দেখে ফিরে মুক্তা এসেছিল তাঁর ঘরে, এসে মশারি ফেলে চারিদিক গুঁজে দিয়ে গেছে। হয়তো তখন সোজা ভাবে সরিয়ে নড়িয়ে দিতেও হয়েছে তাঁর দেহটা। আর সেই সময় ওর সেই মেঘের মত চুলের রাশি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ত্রিবেদী মশায়ের মুখের ওপর। তখন হয়তো ঘুমের ঘোরে সেই চুল দু হাতে ধরে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। মানে চুলগুলো ছুঁতে পেরেছেন।

দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল ত্রিবেদী মশায়ের, কয়েক মুহূর্ত কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। তার পর সজোরে মাথা নাড়িয়ে মনে মনে বললেন—বেশ হয়েছে, সিনেমা দেখতে ছুটেছিল যেমন, তেমনি কষ্ট পেয়েছে। এই বৃহৎ লাশটাকে টেনে-টুনে ঠিক করে শোয়াতে হয়েছে।

হঠাৎ পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সুড়-সুড় করে উঠল তাঁর, কাতুকুতু লাগলে যেমন হয়। একটা অদ্ভুত রকমের অনুভূতিতে বড়ই কাবু হয়ে পড়লেন তিনি, যেন খুবই লজ্জা করতে লাগল। তার পরই মনে হল, ভাগ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নয়তো কি কেলেঙ্কারিটাই না হোত! কি জানি কি ভেবে বসত মুক্তা! হয়তো মনে করত, ওর জন্যেই তিনি জেগে বসে আছেন! হয়তো মনে করত আরও অনেক কিছু। যা খুশি একটা ভেবে বসলেই তো হল, ভাবতে তো আর পয়সা খরচ হয় না।

ভোরের কাজ অনেক, খুব বেশী সময় অপরের ভাবনাচিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয় তখন। বহুকাল ধরে যা করে আসছেন তিনি, তাই শুরু করলেন। চাপা গলায় আওড়াতে লাগলেন—স্তবং-স্তত্র ততঃ শাম্ব কৃশো ধমনিসন্ততঃ। রাজন্নাম-সহস্রাংশুং দিবাকরম্। এই সময়ে সকলেই ঘুমিয়ে থাকে। একটু পরে উঠবে মুক্তা, উঠে মুখ

হাত ধুয়ে তাঁর কাছে আসবে। তার পর দেবে তাঁর তেলের বাটি, দাঁতের মাজন, ঘটি গামছা। ওপর থেকে নিচে নামবেন ত্রিবেদী মশাই, মুক্তা থাকবে তাঁর পিছনটিতে, ঘাটের দরজা খুলে দেবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবেন জলের ধারে ত্রিবেদী মশাই, শেষ ধাপটায় বসবেন জলে পা ডুবিয়ে। ঘটি দিয়ে জল তুলে মাথায় ঢালবেন। চোখ যাওয়ার পর থেকে আর জলে নামেন না, জল তুলে মাথায় ঢেলে গঙ্গাস্নান সমাপন করেন।

গা মুছতে মুছতে শুরু করবেন তখন তিনি—সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ বিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতি। গঙ্গা-স্তব পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়াবেন, গা মোছাও শেষ হবে তখন। গামছা সুদ্ধ হাতখানা বাড়িয়ে ধরলেই নিঃশব্দে গামছাখানা চলে যাবে হাতের ওপর থেকে, মটকা কাপড়খানা সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হবে। ভিজে কাপড় ছেড়ে মটকা কাপড় পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকবেন তখন, পরম নিশ্চিন্তে উঠে আসবেন। ছাড়া কাপড়খানা তুলে নিয়ে নির্ঘাৎ এক জন আসছে পিছনে পিছনে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

ঠিক ছায়ার মত। যখন যেখানে আছেন ত্রিবেদী মশাই ঠিক তাঁর পিছনটিতে আছে। ত্রিবেদী মশাই গন্ধ পান, চোখের কাজ বন্ধ হবার পর থেকে নাক কানের শক্তি বেড়ে গেছে তাঁর। সাড়া শব্দ বড় একটা করে না মুক্তা, কিছু জিজ্ঞাসা না করলে মুখ খোলে না ত্রিবেদী মশায়ের পূজা অর্চনার সময়। কিন্তু গন্ধটা লুকবে কি করে! কোন জিনিসের গন্ধ, তা অবশ্য বুঝতে পারেন না ত্রিবেদী মশাই। মাথায় যে তেল মাখে মুক্তা, সেই তেলের গন্ধই পান তিনি বোধ হয়। কিন্তু তেল মুক্তা মাখে না, ত্রিবেদী মশাই কল্পনাই করতে পারেন না যে মুক্তা তেল মাখে। রুক্ষ চুল, রুক্ষ চোখ মুখ, খাঁটী যোগিনীর বেশ। বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা এক ছড়া গলায় ঝোলালে আরও ভাল মানায়। যোগিনীর গন্ধই পান তিনি নাকে। ত্যাগ বৈরাগ্য তিতিক্ষা

—আহা কটা মানুষ বোঝে এই সমস্ত পবিত্র জিনিসের মূল্য। কটা মানুষ জানে যে ওই সব স্বর্গীয় গুণগুলোর আলাদা একটা গন্ধই আছে। চোখে দেখা বিচারে কি ত্যাগ বৈরাগ্য তিতিক্ষা ধরা পড়ে! ও সব বস্তু মনে প্রাণে অনুভব করতে হয়।

মনে প্রাণে অনুভব করবার তৃপ্তিটুকুতে তলিয়ে গিয়ে সূর্যস্তব শেষ করে ফেললেন ত্রিবেদী মশাই। কবচটাও শেষ হয়ে গেল। তার পর নবগ্রহস্তোত্রম শুরু হল, শেষও হল। তখনও পরিচিত সাড়া-শব্দ একটুও পেলেন না। চুপ করে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলেন কান পেতে। না, কেউ ওঠে নি এখনও। নিঝুম হয়ে রয়েছে সারা বাড়িটা, শুধু কতকগুলো চড়ুই কিচির মিচির করছে। চড়ুইগুলো যখন জেগেছে, তখন নিশ্চয়ই ঠিক সময় উঠেছেন তিনি। কিন্তু হল কি! অনেক রাত্রিতে ফিরেছে কি না তাই উঠতে দেরি হচ্ছে। ঊঠুক যখন ওঠে, এক আধ দিন একটু দেরি হলেই বা ক্ষতি কি। ইতিমধ্যে তিনি হাত মুখ ধুয়ে নিতে পারেন। কলঘরে যাওয়া আসা করতে কারও সাহায্য লাগে না। সবই এক রকম মুখস্থ হয়ে গেছে। গুণে গুণে পা ফেললেই হল। তাঁর ঘরের দরজা থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ফিরে আঠার পা ফেলতে হবে, তার পর ডান দিকে ঘুরে চল্লিশ পা ফেললেই পুব দিকের বারান্দার শেষ সীমানায় পৌঁছনো যাবে। তখন বাঁ দিকে কলঘরের দরজা। কোনও মুশকিল নেই, দিনে রাত্রে অনেক বার নিজেই যাওয়া-আসা করেন ত্রিবেদী মশাই, সব সময় কেউ পিছনে যায় না।

চললেন কল-ঘরের দিকে, অনেকগুলো বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে এগিয়ে চললেন। সর্বপ্রথম দরজাটা মুক্তার ঘরের দরজা, হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখলেন, বন্ধই আছে তখনও। তার পরের দরজা-গুলো বন্ধ থাকেই, কেউ থাকে না সেই ঘরগুলোতে। পশ্চিম দিকের খানা ঘরে ছোট ভাই থাকে। সে বারান্দায় যেতে হলে ত্রিবেদী মশায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে প্রথমে আঠার পা হাঁটতে

হবে। তার পর বাঁ দিকে ঘুরলেই পশ্চিমের বারান্দায় পা পড়বে। বড় একটা যান না সে দিকে ত্রিবেদী মশাই, যাবার দরকারও পড়ে না।

কলঘর থেকে ফিরে এলেন যখন, তখনও নিঃশব্দ চারিদিক। ব্যাপার কি! হল কি সকলের! আজ একেবারে সেই ছপুরের আগে কেউ উঠবেই না নাকি!

ওধারে সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্নান করতে হবে, তার পর গিয়ে অনন্তদেবের ঘুম ভাঙাতে হবে। অপরাধ ঘটে, যে সময়ের যে কাজ সেটুকু সে সময় না করলে নিত্যসেবায় ত্রুটি হয়।

কে কতক্ষণ সহ্য করতে পারে ত্রুটি। ঠাকুরই হক মানুষই হক, অবহেলা বরদাস্ত করার শক্তি কারও নেই। ত্রিবেদী মশায়েরও সহ্যের সীমানা পার হল। ঠিক করলেন, একলাই যাবেন তিনি গঙ্গায়, ঠিক যেতে পারবেন। স্নান করে ভিজে কাপড়েই যাবেন ঠাকুর-ঘরে, ঠাকুর ঘরের চাবি তাঁর কোমরেই থাকে, ঘুম ভাঙানো তো হক ঠাকুরের। তার পরও যদি কেউ না ওঠে, তখন ভিজে কাপড়েই পূজায় বসবেন। গঙ্গাজল দিয়েই পূজা করবেন! অন্ততঃ আহ্নিকটা সারতে পারবেন ঠিক সময়। রোজই তাই হয়, তিনি আহ্নিকে বসেন, ওধারে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে ফুল তুলে দেয় মুক্তা, চন্দন ঘষে দেয় নৈবিদ্যের যোগাড় করে। দেখা যাক্, ঠাকুরের কি ইচ্ছা। অনর্থক এ ভাবে পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। সত্যিই তো আর পঙ্গু হন নি, শুধু চোখ ছুটিই খোয়া গেছে। যাক্ গে, চোখ না থাকলেও কিছু আটকাবে না।

কলঘরের পাশে সিঁড়ি, সুতরাং আবার গুণেগুণে আঠার পা এগিয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাই, তার পর ডান দিকে ঘুরে চল্লিশ পা ফেললেন। বাঁ হাত বাড়িয়ে কলঘরের দরজাটা ছুঁয়ে আর ছু পা মাত্র এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরলেন। সামনেই সিঁড়ির দরজা, রাত্রে ভেতর দিক থেকে শিকল লাগানো থাকে। হাত তুলে দরজার মাথায় শিকলটা

ধরতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে নিতে হল।

একি! শিকলটা কপাটের গায়ে ঝুলছে কেন! কে গেছে নীচে!

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ব্যাপারটা কি! শিকলটা তুলে দেবার কথা কারও খেয়ালে আসে নি নাকি! কি সাংঘাতিক কাণ্ড দেখ! চোর ছ্যাঁচোড় যদি ওঠে আসত ওপরে! নীচে তো কেউ থাকে না।

নামতে লাগলেন সাবধান হয়ে। উঁচু উঁচু সিঁড়ি, ডান দিকের দেওয়ালে হাত রেখে সিঁড়ি গুণে গুণে নামতে লাগলেন। সিঁড়িও গোনা আছে তাঁর। বারো ধাপ নেমে ডান দিকে ঘুরতে হবে। তার পর আবার দশ ধাপ নামতে হবে। তখন পা পড়বে নীচের দালানে। মস্ত চওড়া দালান, রঙ্-বেরঙের ভাঙা কাঁচ বসানো মেঝেয়। ভাঙা কাঁচ দিয়ে নানারকম চিত্র-বিচিত্র সৃষ্টি হয়েছে। সেই আগের কালের শৌখিনতা। বিশ্রী রকম নোংরা জমে কাঁচের ফাঁকে ফাঁকে। এটুকু জ্ঞানও বোধ হয় ছিল না তখন কারও যে হাজার ধোয়া মোছা করলেও ঐ নোংরা মেঝে সাফ হয় না। সাফ না হলেও ক্ষতি নেই, নীচে কেউ থাকেই না। সব কটা ঘর বন্ধ। ঘরগুলো ঠিক ঘরের মত নয়, প্রত্যেকখানি এক একটা গড়ের মাঠ। মানে—উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম চার দিকে চারটি মাত্র ঘর। আর সেই চারখানি ঘরের সামনে দিয়ে বিরাট চওড়া বারান্দা ঘুরে গেছে। বারান্দার সামনে মোটা মোটা থাম। থামের আপাদমস্তক সেই রঙ্‌বেরঙের ভাঙা কাঁচ দিয়ে দিয়ে মোড়া। যাকে বলে খানদানী কাণ্ডকারখানা, খাঁটী নবাবী নটখটি।

বহুবার পড়া পুঁথির মত সবই মুখস্থ হয়ে আছে। থাকবে না কেন, দৃষ্টিশক্তি বজায় ছিল যখন, তখন কত শত বার ঘুরে বেড়িয়েছেন বাড়িময়, তার কি কোনও হিসেব আছে! নীচের ঘর চারখানির নামও আলাদা আলাদা। দক্ষিণ দিকের ঘরখানির নাম মুসায়েরা মঞ্জিল, ওখানি নাকি ব্যবহার হত কবিসম্মেলনের জন্যে। সে ঘরের দেয়াল-গুলোয় এন্তার আরবী ফারসী কবিতা খোদাই করা হয়েছে। দেওয়ালের

রঙ্ মিসমিসে কালো, তার ওপর সাদা রঙের বাঁকাচোরা রেখাগুলোকে দেখে মনে হয়, বহু রকমের জীব জন্তুর হাড়গোড় ছড়িয়ে পড়েছে যেন। পুবের ঘরখানির নাম মাশুক মজলিশ। গঙ্গার ধারের ঘর, সে ঘরের জাঁকজমকই সব চেয়ে বেশী। সামনের পেছনের সবকটা জানালা দরজায় নানা রকম নকশা তোলা বহু মূল্যবান সবুজ কাঁচ লাগানো। ভেতরের দেওয়ালে দেওয়ালে নদী পাহাড় বন উপবন আঁকা হয়েছে। দলে দলে ময়ুর পেখম তুলে নাচছে গাছের ডালে, তলায় বন-হরিণীরা মুখ উঁচু করে ময়ুরের নাচ দেখছে। যেখানে সেখানে ওড়না ঘাঘরা কাঁচুলি পরা নর্তকীরা দু পায়ে নূপুর বেঁধে অদ্ভুত কায়দায় বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরিণীরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তাকাচ্ছে না, কারণ তাকাবার সাহস হয় না নর্তকীদের দিকে। তাদের শরীরের গড়ন বড়ই বিপদজনক। কোমর এমন সরু আর কোমরের ওপরের অংশটা এত ভারী যে ভয় হয়, এই বুঝি ওপরের ভারে মটাং করে মচকে পড়ে কোমরের কাছটা। নর্তকীদের আশেপাশে গালিচা বিছিয়ে বসে গেছে বাজিয়ের দল। তাদের দাড়ি গোঁফ পাট্টা পাগড়ির বাহারে ময়ুরের পেখমও ম্যাড়মেড়ে বলে মনে হচ্ছে। সব স্বদ্ধ নিলিয়ে ইলাহী কাণ্ড যাকে বলে।

সত্যিকারের ইলাহী কাণ্ডকারখানাই ঘটত নাকি তখনকার দিনে মাশুক মজলিশে। ত্রিবেদী মশায়ের কপালের তলায় রক্তবর্ণ গর্ত দুটোতে বড় বড় দুটো চক্ষু যখন বর্তমান ছিল, তখন তিনি আশ মিটিয়ে দেওয়ালের ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। দেখতে দেখতে বিলকুল ছবির হুবহু নকল ফুটে উঠেছে তাঁর মনের পর্দায়। তাই এখন আর দেওয়াল না দেখলেও চলে, মনের ভেতরেই সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পান। মাশুক কথাটির অর্থও তিনি জেনে নিয়েছিলেন এক মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে। মাশুক মানে যে প্রেমে পড়েছে, সোজা কথায় প্রেমপাগলার নাম মাশুক। অর্থাৎ কি না মাশুক মজলিশ হচ্ছে প্রেমপাগলাদের পাগলা গারদ।

সেই পাগলাগারদের সামনের দালানটা আগাগোড়া পার হলে পুব উত্তর কোণের দরজায় পৌছনো যাবে, সেই দরজা দিয়ে বেরলেই দোতলা সমান উচু পাঁচিল ঘেরা মস্ত বড় আঙিনা। আঙিনার উত্তর দিকে অনন্তদেবের জন্যে মন্দির বানিয়ে দিয়েছেন ত্রিবেদী মশায়ের শিষ্যরা। পুব দিকের দেওয়ালে এক রাক্ষুসে ফটক। ফটকের কপাট জোড়া বানাতে আস্ত একটা জঙ্গলই বোধ হয় সাফ হয়েছিল। জনা দশেক জোয়ান লাগালে হয়তো একটা কপাট ঠেলে নাড়ানো সম্ভব। কোনও কালে সে কপাট খোলা হয়েছে কি না সন্দেহ। ঘাটে যাবার জন্যে একখানা কপাটের পায়ের কাছে এক ফালি দরজা কাটা হয়েছে। মাথা নুইয়ে একটা মানুষ অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারে সেই ফাঁক দিয়ে। তার পর চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে গঙ্গাগর্ভে নেমে গেলেই হল। কোনও ভয় নেই, গলা সমান জলে গেলেও সিঁড়ি ফুরবে না।

সবই যেন খুব স্পষ্ট ভাবে দেখতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই, দেখতে দেখতে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। কই—চোখ না থাকার দরুন কিছু মাত্র তো অসুবিধা হচ্ছে না! খামকা তবে কেন সব সময় এক জন তাঁর পিছু পিছু হাঁটবে। এখন থেকে তিনি একলাই চলে ফিরে বেড়াবেন, স্নান করতে আসবার সময় কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না। তিনি কি পঙ্গু না অথর্ব যে তাঁকে আগলে নিয়ে বেড়াবে!

সিঁড়িগুলো শেষ করে নীচের তলায় পৌছলেন ত্রিবেদী মশাই। এইবার তাঁকে মাশুক মজলিশের সামনে দিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পা চলতে হবে।

চললেন

কয়েকবার পা ফেলবার পরেই চরণ দুখানিকে কামড়ে ধরল নবাবী নকশা কাটা মেঝে। একটি আঙ্গুল তোলবার মত শক্তিও রইল না শরীরে, অথর্ব পঙ্গু নন বলে একটু আগে যে উত্তাপটুকু উপভোগ করেছিলেন, সে উত্তাপ জমে বরফ হয়ে গেল। শোনবার

যন্ত্রই শুধু বেঁচে রইল, বেঁচেই রইল না শুধু, ভয়ানক রকম জীবন্ত হয়ে উঠল। সেই যন্ত্রের মুখে মনটাকে চেপে ধরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই।

মাশুক মজলিশ জেগে রয়েছে।

একটা সংকেত, সামান্য একটু রহস্যময় ফিসফিসানি হঠাৎ ধরা পড়েছে তাঁর শোনার যন্ত্রটায়। কোনও সন্দেহ নেই যে আশেপাশে জীবন্ত জীব রয়েছে। নিশ্চয়ই রয়েছে, কিছুতেই তাঁর অতি সতর্ক চৈতন্য ধোঁকায় পড়তে পারে না। আর একটিবার শোনা চাই। তা হলেই সংকেতের প্রাণপাখীটিকে সংশয়াতীত ভাবে তিনি সংহার করতে পারবেন।

একটা একটা করে দম আটকানো মুহূর্তগুলো পাশ কাটিয়ে পালাতে লাগল, কোথাও একটু স্পন্দন মাত্র নেই। একটা নীল শির খাড়া হয়ে উঠল ত্রিবেদী মশায়ের কপালের মাঝখানে, ডান পাখানা জোর করে ছাড়িয়ে নিলেন মেঝের গ্রাস থেকে। চরণখানি আর সামনে ফেলতে হল না, মাশুক মজলিশ আবার ফিসফিসিয়ে উঠল।

"আঃ ছাড় না, দেরি হয়ে যাবে যে—"

চাপা গলার স্বরটা কেমন যেন এলিয়ে পড়ল। ছাড়া পাবার আশায় যে বাক্য কটি ব্যবহার করা হল, তার অর্থটা যেন উলটে গেল সুরের জন্যে। ফলে বেশ কয়েকটি মুহূর্ত জুড়ে রহস্যময় ধস্তাধস্তির আওয়াজ ধরা পড়ল ত্রিবেদী মশায়ের শ্রবণ-যন্ত্রে। শেষে আর এক বার খুবই নিবিড় চাপা স্বরের ছোট্ট দুটি বাক্য জন্মলাভ করল—"ছিঃ কি দুষ্টু।"

বিষাক্ত প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা নয় ছুঁচ বিঁধোবার জ্বালা। কপাল মুখ কান সমস্ত তেতে আগুন হয়ে উঠল। অতি অল্পক্ষণই সইতে হল সেই জ্বালাটুকু। হঠাৎ একটা ঝটকানি দেওয়ার মত আওয়াজ হল, সেই সঙ্গে বিচিত্র একটু সুরের ঝংকার। সামান্য একটি কথা আটকে গেল মগজের জালতিতে "যাঃ-ও"। ঝংকারটা মিলিয়ে যাবার আগেই অতি

দ্রুত হালকা পায়ের শব্দ উঠল। মাশুক মজলিসের গর্ভ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে এল যেন কে। পরমুহূর্তেই একটা ধাক্কা খেলেন বুকের ওপর ত্রিবেদী মশাই, আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ হল—"ইঃ—"। এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল ত্রিবেদী মশায়ের পাশ দিয়ে, ছাতের বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ বুঝি উড়ে গেল সাঁ করে। ব্যস, তার পর সব নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল, মাশুক মজলিশের প্রাণ পাখীটাই যেন উধাও হয়ে গেল আকাশে। একেবারে মড়ার মত শীতল হয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাই, সত্যিই বেশ কাঁপতে লাগলেন যেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনিও একদম মরেই গেছেন।

কখন যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হল, কখন যে ঘষে ঘষে এগোতে লাগলেন আবার, তা মোটেই টেরই পেলেন না। কেমন করে নামলেন গিয়ে গঙ্গায়, তা একমাত্র তাঁর অনন্তদেবই জানেন। কয়েকটা ডুব দেবার পরে একটু একটু করে সংবিৎ ফিরে এল। বুঝতে পারলেন যে বুক জলে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেক দিন পরে ডুব দিতে পেরে অনাবিল তৃপ্তিতে মনটা জুড়িয়ে গেল। বুক ভরে হাওয়া নিয়ে দু হাতে দু কান চেপে ধরে আবার দিতে লাগলেন ডুব। দম ছাড়বার জন্যে থামেন কয়েক মুহূর্ত, তার পর আবার ডুব দিতে শুরু করেন হাওয়া টেনে নিয়ে! এই ভাবে চলতেই লাগল ডুব দেওয়া, চলতেই লাগল সমান তালে ডুবতে ডুবতে ষোল আনা হুঁশ ফিরে এল। বুঝতে পারলেন, হঠাৎ তাঁর চৈতন্যের ভাঁড়ার ঘরে বিষম রকম ওলট-পালট ঘটে গিয়েছিল। আগের চিন্তাটার সঙ্গে পরের চিন্তার সঙ্গতি ছিল না। তাল কেটে গিয়েছিল জীবনসঙ্গীতের। বদ্ধ কালাই হয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়। স্থাবর জঙ্গম সব কিছুর সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কি ভয়ানক অবস্থা! বার বার শিউরে উঠল সারা শরীরটা, মুখ নুয়ে পড়ল, থুতনি ঠেকে গেল বুকের সঙ্গে। গুড় গুড় করে কাঁপুনি উঠে গেল বুকের মধ্যে, অবরুদ্ধ একটা উচ্ছ্বাস ঠেলে বেরোবার চেষ্টা

করতে লাগল ভেতর থেকে। বিষম রকম চাপ পড়ল গলায়। বুঝতেও পারলেন না ত্রিবেদী মশাই যে তিনি কাঁদছেন। বুঝতে পারলেই বা কি হত! কেন কাঁদছেন, কান্নার কারণটা কি, এই সব প্রশ্নের সদুত্তর কিছুতেই নিজেকে দিতে পারতেন না।

হীরামন্ হাবেলীর আঙিনায় অনন্তদেবের মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। হয়ে গেল অনন্তদেবের সকালের পালা শেষ। একটু দেরি হল, বড়ই মন্থর গতিতে মন্ত্রগুলি পাঠ করলেন সেদিন ত্রিবেদী মশাই। অনেক বার অনেক জায়গায় আটকে গেল মন্ত্র আওড়ানো, একই মন্ত্র দু-তিন বার করে বললেন। আরও নানা রকমের গোল-মাল ঘটল। অনন্তদেবকে স্নান করিয়ে সোনার পৈতে পরাবার সময় পৈতেটা কিছুতে খুঁজে পেলেন না, ফুলের থালার ওপর পঞ্চ-প্রদীপ নামিয়ে রাখলেন, নৈবেদ্য নিবেদন করার সময় জলের ছিটা নৈবেদ্যের থালায় না দিয়ে উলটো দিকে ফেললেন। করলেন সমস্তই, কিন্তু সবই কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে করে গেলেন। অবশেষে পূজা সমাপ্ত করে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন হাঁটু দুটো মুচড়ে রইল। শরীরের ভার বইবার সামর্থ্য নেই পা দুখানার, মাথাটা সোজা ভাবে খাড়া রাখবার শক্তি হারিয়েছে ঘাড়টা। যে শরীরের কোথাও এতটুকু টোল খায় নি, সেই শরীরটা হঠাৎ দুমড়ে কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে। অদৃশ্য একটা বোঝা ঘাড়ে করে বেরোলেন ঠাকুর ঘর থেকে, বোঝাটার ভারে সামনে নুয়ে পড়ে এগিয়ে চললেন। উঠান পার হলেন, মাশুক মজলিশের সামনের দালান পার হলেন, সিঁড়িগুলো শেষ করলেন। অবশেষে ওপরের দালানে পৌঁছে দম নেবার জন্যে দাঁড়ালেন। বোঝার ভারে তখনও নুয়ে আছেন সামনে, কিছুতে আর মাথাটা সোজা রাখতে পারছেন না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে তাঁর দেহে। ভোর বেলা যে ঋজু দীর্ঘ দেহখানি নিঃশব্দে নেমে গিয়েছিল

নীচে, সে দেহখানিকে জরা স্পর্শ করতে পারে নি। বিশুদ্ধ মাখন জ্বাল দিলে টলটলে গরম ঘিয়ের যেমন বর্ণ হয়, তেমনি বর্ণের অতি মসৃণ পাতলা চামড়ায় টান টান করে ঢাকা ছিল যে দেহখানি, সেখানি আর আর ফিরে এল না। কপালে মুখে বুকে সর্বশরীরে অনেকগুলো খাঁজ পড়ে গেছে, তার ওপর পাতলা করে নীল গুলে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। খাটো করে কাটা চুলগুলোর রঙ কোকিলের মত চকচকে কালো ছিল, সে রঙ্‌ও কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে। যেন গোটা দশেক বছর পার করে দিয়ে উঠে এলেন ওপরে ত্রিবেদী মশাই, যখন নেমেছিলেন তখন তাঁর বয়েস পাঁচের কোঠায় পা দেয় নি। উঠে এলেন ছয়ের কোঠায় পৌঁছে। এসে ষাট বছরের বুড়োর মত সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

ছোট ভাই চতুরানন ত্রিবেদী প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পড়লেন সিঁড়ির মুখে, আপিসে বেরোচ্ছেন তিনি। দাদাকে ও-ভাবে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর বেগে গমনটা প্রাণ হারিয়ে ফেললে। খানিক আগেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত দাদার দিকে তাকিয়ে থাকবার পরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন—কি হল দাদা! হল কি? পড়ে গিয়েছিলে নাকি কোথাও! না হোঁচট খেলে কিছুর সঙ্গে? বলতে বলতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত দাদা মাথা খাড়া করতে পারলেন না। তার পর আস্তে আস্তে ঘাড় সোজা করে বললেন—না, কই—কিছুই হয় নি তো। কথাকটি খুবই ক্ষীণ স্বরে বার হল। তার পর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে অনেকটা সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—দেরি হয়ে গেল না তো রে? ঠিক সময় পৌঁছতে পারবি তো আপিসে? চতুরানন জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন দাদাকে। দেখতে দেখতে তাঁর মুখও শুকিয়ে গেল। একি হল। হঠাৎ দাদা বুড়ো হয়ে গেল যে!

দাদা এবার দস্তুরমত সামলে উঠেছেন। সত্যিকারের চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর স্নিগ্ধ শান্ত নিরুদ্‌বেগ সুর সজাগ হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠে।

বললেন—এস, এস এবার ভাই। দুর্গা দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি।

চতুরানন চলে গেলেন। সিঁড়িতে পা দেবার আগে এক বার পিছন ফিরে তাকালেন, দাদা এগিয়ে যাচ্ছেন নিজের ঘরের দিকে। না, তেমন কিছুই হয় নি। সবে মাত্র পূজা সেরে উঠলেন কি না, তাই একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দেখাবেই, অতক্ষণ এক আসনে সোজা হয়ে বসে ন্যাস প্রাণায়াম করা সহজ নাকি! কিন্তু কি করেই বা দাদাকে অনন্তদেবের সেবা থেকে রেহাই দেওয়া যায়! পূজারী এক জন রাখলেই চলে, কিন্তু কার সাহস হবে সে প্রস্তাব দাদার সামনে উত্থাপন করতে! দৃষ্টি যখন গেল, তখন এক বার কথাটা উঠেছিল। ফল—দাদা অন্নজল স্পর্শ করা ছেড়ে দিলেন। কি যে করা যায়! ভাবতে ভাবতে ছোট ভাই আপিসে চলে গেল।

বড় ভাইও ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে এসে পৌঁছলেন। ভাবতে তাঁকে হবেই, ভাবনা চিন্তা করে উপায় একটা খুঁজে বার করতেই হবে। বিশ্বাস নেই, মোটে বিশ্বাস করা চলে না নিজেকে, ঠক্‌জোচ্চোর নিতান্ত নির্লজ্জ বেহদ্দ হ্যাংলা এক জন বসে আছে তাঁর বুকের ভেতরে, তাকে তিনি আজ চিনে ফেলেছেন। চতুর্ভুজ ত্রিবেদীকে সে নাজেহাল করে ছেড়েছে। অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান রক্ষা করতে পারে নি চতুর্ভুজ ত্রিবেদীকে। সর্বনাশা একটা চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। একটু একটু করে পা দুখানা তলাচ্ছে। এখনও সময় আছে, আর নয়। তিল মাত্র বিশ্বাস রাখা চলে না চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রজ্ঞান সাধন ভজনের ওপর, চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে কোনও কিছুতেই আস্থা রাখা অন্যায়। কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার উপায় একটা বার করতে হবেই। চোরাবালি থেকে পালাতেই হবে।

ঘরে ঢুকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন কাঠগুলোর কাছে। চুপচাপ শুয়ে আছে কাঠগুলো, নীচে পাঁচ মন বেল তার ওপর মণ দেড়েক চন্দন। শুখিয়ে টনটন করছে সব, ছিটে ফোঁটা রস নেই ওদের দেহে।

শুখোবে না। এত দিনেও শুখোবে না! এমন চমৎকার শুখিয়েছে যে একটি দেশলাই কাঠির ওয়াস্তা, একটি কাঠি খরচা করলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। জ্বলবার জন্যে তৈরী হয়ে প্রতীক্ষা করছে ওরা, অধীর আগ্রহে তাকিয়ে দেখছে তাঁকে। ভাবছে, কত দেরি আর! আর কত দিন মুখের গ্রাস মুখের সামনে রেখে অপেক্ষা করতে হবে!

একখানি হাত বাড়িয়ে আলতো ভাবে স্পর্শ করলেন কাঠের পাঁজাটা, সন্তর্পণে তুলে নিলেন একখানি চন্দন। ওজনটা আন্দাজ করলেন। বাঃ, কি সুন্দর হালকা। শুখিয়ে শুখিয়ে অর্ধেক ওজনে দাঁড়িয়েছে। সুবাস কিন্তু একটুও কমে নি, বরং বেশ বেড়েছে বলা চলে। নাকের কাছে না তুললেও বাসটুকু পাওয়া যায়। আঃ, গন্ধটুকু কেমন শীতল। শরীর মন জুড়িয়ে যায়।

জুড়িয়ে দেবার শক্তি আছে আবার পুড়িয়ে দেবার আগুনও রয়েছে। এক সঙ্গে দু জাতের দুটো শক্তি লুকিয়ে রয়েছে কাঠের অন্তরে। কি আশ্চর্য কাণ্ড!

নতুন আশ্চর্য একটা সত্য উপলব্ধি করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, কাঠখানা হাতেই রয়ে গেল। হাতখানি রইল বুকের সামনে উঁচু হয়ে, গন্ধটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকতে লাগল। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল তখন। একে একে আস্তে আস্তে অনেক রকমের গন্ধ ধরা দিতে লাগল তাঁর শরীরের মধ্যে লুকনো গন্ধ ধরবার যন্ত্রটায়। গন্ধগুলো যেন এক একটা ছবি, ছবিগুলো একে একে ফুটে উঠতে লাগল তাঁর মনের পর্দায়। ধূপের ধোঁয়ায় যে গন্ধ লুকিয়ে থাকে, নতুন সুগন্ধি আতপ চাল আর নানা রকমের কাটা ফল দিয়ে নৈবেদ্য সাজালে পূজার ঘরে যে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, ফুলের গন্ধ, বেলপাতার গন্ধ, তুলসী পাতার গন্ধ, গাওয়া ঘি আহুতি দিলে যে গন্ধ ওঠে, সব একে একে এসে তাঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। কত-রকমের গন্ধই যে এল, বহুকাল আগে বহুদূরে একটি বার মাত্র যে গন্ধ

পেয়েছিলেন সে গন্ধটিও এসে উপস্থিত। কি কাণ্ড দেখ! আচ্ছা, এই গন্ধটা কবে কোথায় পেয়েছিলেন তিনি! আচ্ছা, আচ্ছা, মনে পড়েছে। সেই সেবার খুলনা থেকে গহনায় চেপে গিয়েছিলেন সাতক্ষীরা মহকুমায়। সারা রাত এই গন্ধটা ভয়ানক বিরক্ত করেছিল। সকালে বুঝতে পেরেছিলেন গন্ধটা উঠছে কি থেকে। বড় বড় গাছ জঙ্গল থেকে কেটে এক সঙ্গে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদীই গাছগুলো বয়ে নিয়ে চলেছে। পচছে জলের ভেতর গাছের ছাল, তারই গন্ধে সারা রাত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। সেই গন্ধটা এত কাল পরে আবার পেলেন, স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, গন্ধটা তাঁর ভেতরেই লুকিয়ে ছিল। অর্থাৎ জীবন ভোর যখন যে গন্ধটা শুঁকতে হয়েছে সবই জমে আছে তাঁর দেহে। কিছুই হারায় নি, খোয়া যায় নি একটিও গন্ধ ভাল মন্দ সব রকমের গন্ধ বজায় রয়েছে শরীরের ভেতরে। গন্ধের একটা ভাঁড়ার, বা একথাও বলা চলে শরীরটাই গন্ধ দিয়ে গড়া। সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ, সব রকমের সব জাতের গন্ধ রয়েছে শরীরে। এত বড় একটা গন্ধের ভাঁড়ার বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি! আশ্চর্য তো!

কারণটা খুঁজতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই, খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ পেয়ে গেলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের একটা গন্ধ। গন্ধটা ভাল কি মন্দ, বুঝতেই পারলেন না। গন্ধটা কিসের, কবে কোথায় শুঁকেছিলেন গন্ধটা, খেয়ালে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করতে হল, অন্য গন্ধগুলোর বেলায়—যেমন চট করে তার ইতিহাসটাও স্মরণ হয়েছিল, এবার সে রকম হল না। অনেকক্ষণ পরে হল স্মরণ এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এক রকম বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। গন্ধটা শুঁখতে শুঁখতে চক্ষু-বিহীন চোখের গর্ত দুটো মেলে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন একটা দৃশ্য। দেখতে দেখতে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

বহুকাল আগে—হ্যাঁ—অনেক—অনেক—অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে মাঝখানে—এই গন্ধটা শুঁকেছিলেন তিনি আর চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন একটা জ্বলন্ত আগুনের পানে। ছুটে বেড়াচ্ছিল আগুনটা

ঘরের মধ্যে। ছোট এক খানা ঘর, চতুর্দিকে টিনের বেড়া ওপরে টিনের চাল। ঘরে আসবাবপত্র বলতে যা কিছু ছিল, তাতে আগুন ধরে গেলেও খুব বেশী ক্ষতি হত না। খানকয়েক খুব বিশ্রী জাতের কাপড়জামা, এক গাদা ছেঁড়া লেপ তোশক বালিশ আর অতি পুরনো গোটা কতক থালা বাসন। পুড়ত যদি সব, আপদ যেত। জঞ্জাল কিছু কমত পৃথিবী থেকে। কিন্তু পুড়তে পেল না, কয়েকটা লোক ঢুকে পড়ল ঘরে। লেপ তোশক তুলে নিয়ে ছুঁড়ে চাপা দিলে সেই ছুটন্ত অগ্নিশিখাটাকে; আগুন নিভে গেল, ছোটা বন্ধ হল, ঘরখানা আর ঘরের জঞ্জালগুলো রক্ষা পেল। সেই বিশ্রী গন্ধটা কিন্তু চাপা পড়ল না বা মিলিয়ে গেল না। সেটা ঠিক বেঁচে রইল, ঘর থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে। সমস্ত গ্রামখানা সেই গন্ধে ডুবে রইল অনেকক্ষণ। আশ-পাশের অনেকগুলো গ্রামেও পৌছে গেল সেই গন্ধ, জানতে বাকী রইল না কারও কোথাও কি হয়েছে। বিশেষ কিছু হয় নি, গায়ে কেরাসিন তেল এক বোতল ঢেলে রসরাজ ভরদ্বাজের বউটা পুড়ে মরেছে। মাংস পোড়া গন্ধ, কাঁচা জ্যান্ত মাংস পুড়ছিল। তাই অমন বিকট গন্ধ ছড়িয়েছে।

শুনে সবাই নিশ্চিন্ত হল। যাক্, তা হলে বিশেষ কিছুই নয়। রসরাজের বউটা তা হলে নিষ্কৃতি পেল বেঁচে থাকার হাত থেকে। যাক্ বাঁচল হতভাগী—

এ গ্রাম ও গ্রাম দশখানা গ্রামের নারী-পুরুষ এক সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রসরাজের বউটার মাংস পোড়া গন্ধ শুঁকে। ত্রিবেদী মশাই শুধু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ভয়ানক রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ইস্ এত দুর্গন্ধ লুকিয়ে ছিল ছোট্ট ঐটুকু শরীরের মধ্যে। কই—না পোড়া পর্যন্ত কিছুই বোঝা যায় নি তো!

ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই, তখন ঘাবড়াবার মতই বয়স ছিল তাঁর। ঠোঁটের ওপর নরম পাতলা চুল সবে মাত্র দেখা দিয়েছে সে সময়। আকাশের রঙ কত বার কিভাবে পালটায় তার হিসেব না

রাখলে খুব বড় লোকসান হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। নদীতে যখন তুফান ওঠে তখন তুফানের মাঝে ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রাণের মধ্যে আঁকু-পাঁকু করে। এই রকমের বয়সে যখন পৌঁছয় মানুষ তখন অল্পেতেই ঘাবড়ায়। রোগা ছিপছিপে পলিমাটি রঙের একটুখানি শরীর, সদা সন্ত্রস্ত খুব টানা টানা দুটি চক্ষু, আর খুব সাদা ছোট ছোট দাঁত কয়েকটা, যে দাঁতগুলো প্রায় সর্বক্ষণই দেখা যেত, যেন অদ্ভুত জাতের একটু নিঃশব্দ হাসি লেগেই আছে মুখে, সেই মুখ চোখ দাঁত সুদ্ধ ছোট্ট দেহটা পুড়লে অমন বিদকুটে গন্ধ বার হয়, তা তখন জানা ছিল না যে। ফলে সেই বয়সের চতুর্ভুজ ত্রিবেদী বিশেষ রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ঘাবড়ে গিয়ে নিজের শরীরটা সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন হয়ে উঠে-ছিলেন। কে বলতে পারে, কি জাতের গন্ধ বার হবে তাঁর নিজের শরীরটা যখন পুড়বে! তখন থেকেই চন্দনকাঠ ঘি ধুনো আতরের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন। পুড়তে তো এক দিন হবেই।

হাঁ—পুড়তে হবেই এক দিন—পোড়ার জন্যে প্রস্তুতও হয়ে আছেন। পুড়বেন যখন তখন যাতে রসরাজ ভরদ্বাজের বউ-পোড়ার গন্ধ না বার হয়, সে জন্যে চন্দনও পুড়বে তাঁর সঙ্গে। বেল কাঠ আর ঘি এক সঙ্গে পুড়ে হোমের গন্ধ বার হবে, সেই সঙ্গে ধুনো গুগ্‌গুল কর্পূর তো রইলই। আর কি চাই! এত উপচার সহ পুড়লেও কি দুর্গন্ধ বার হতে পারে! অসম্ভব।

রসরাজ ভরদ্বাজের বউটার সম্বল ছিল মাত্র এক বোতল কেরোসিন, তাঁর রয়েছে এক টিন বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত। আকাশ-পাতাল তফাত। তা ছাড়া সে পুড়েছিল জ্যান্ত অবস্থায়, তিনি পুড়বেন মরে। হুঁঃ—কিসে আর কিসে! দূর, দূর, বিশ্রী গন্ধ অমনি বেরোলেই হল কি না। খামকা যত বাজে চিন্তা মগজে উদয় হচ্ছে। অনন্তদেব, অনন্তদেব, শ্রীমধুসূদন—

ইষ্টদেবতা অনন্তদেবকে স্মরণ করে বাজে চিন্তাগুলোকে বর্জন কর-

বার চেষ্টা করলেন ত্রিবেদী মশাই। চিন্তাটা গেল কিন্তু গন্ধটা গেল না। রসরাজ ভরদ্বাজের সেই একরত্তি বউটার শরীরে সত্যিই কি অত দুর্গন্ধ লুকিয়ে ছিল! কোথায় ছিল লুকিয়ে! মানুষটাই ছিল রাশীকৃত চুলের মধ্যে তলিয়ে, চুলের দরুন মানুষটাকেই ভাল করে দেখা যেত না। কোনও দিন এক ফোঁটা তেল জুটত মাথায় দিতে। কেউ কখনও হাত দিয়ে ছুঁতও না সেই চুলের বোঝা ফুলে ফেঁপে মা দুর্গার বাহনের কেশরের মত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত সেই চুলের বন্যা চারিদিকে। একেবারে লুকিয়ে থাকত সেই ছোট্ট দেহখানি চুলের আড়ালে। চেন কি করে চিনবে!

সত্যিই প্রথম দিন একেবারে চিনতে পারেন নি ত্রিবেদী মশাই, মানুষ বলে ধারণাই করতে পারেন নি। কি করে পারবেন! সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে তখন, শ্রাবণী পূর্ণিমার আকাশ এত কাছে নেমে এসেছে যে ইচ্ছে করলে সুপুরি গাছের মাথায় উঠে ছুঁয়ে ফেলা যায়। সেই আকাশের গায়ে রয়েছে কয়েকটা ফুটো, তার ভেতর দিয়ে নজর চালালে দূরে-বহু দূরে দেখতে পাওয়া যায়, নীলে সোনায় মেশানো গঙ্গার জল। আকাশ-গঙ্গায় তখনও দিনের আলো ঝলমল করছে। ত্রিবেদী মশাই, সেই তখনকার দিনের ত্রিবেদী মশাই, সদ্য যিনি কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়ে গাঁয়ে ফিরেছিলেন, তাঁর হঠাৎ খেয়াল চেপেছিল কেয়া ফুল সংগ্রহ করবার। তাই ছুটেছিলেন খালের পাড়ে। কেয়া বনে সাপ থাকে, ভর সন্ধ্যাকালে কেয়া বনে যাবার সাহস আছে কার! কাব্যের পরীক্ষা দেওয়া তখনকার সেই চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর ছিল, শ্রাবণী আকাশের অন্তরালে নীলে সোনায় মেশানো আকাশ-গঙ্গার ছোঁয়া পায় যার মন তার কি কোনও হুঁশ জ্ঞান থাকে।

মানুষের মাথার ওপরে উঠে গেছে পাট গাছ, পাট গাছের সমুদ্র গাঁয়ের চারিদিকে। পাট ক্ষেতের আল নজরে পড়ে না। যে পারে সে কিন্তু সোজা ছুটতে পারে সেই অদৃশ্য আলের ওপর দিয়ে। আলের মাথা আধ হাত চওড়া দু পাশে হাঁটু সমান জল, পা ফসকালেই ঝপাং।

কিন্তু ফসকাবে কেন? কাব্য পরীক্ষার আগে ঐ আলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন চতুর্ভুজ ত্রিবেদী। সেই উদম থাকার বয়স থেকে আলে আলেই ছুটে বেড়িয়েছেন। পা ফসকাল না, কিছুই হল না, সোজা খাল পাড়ে গিয়ে উঠলেন। উঠে কয়েক হাত এগিয়ে গিয়ে উলটো দিকে সাবধানে নামতে লাগলেন। সাবধান হতেই হবে সেখানে, ভয়ানক পিছল। খালের জল নেমে যাওয়ার দরুন আধ হাত পলি পড়েছে। পা পিছলালে একবারে কেয়া ঝাড়ের ভেতর গিয়ে পড়তে হবে। তার মানে তৎক্ষণাৎ একটি সাদর চুম্বন প্রাপ্তি।

কোথাও কিছু নেই, প্রকাণ্ড একটা বস্তু যদি আছড়ে পড়ে ঘাড়ে, তা হলে কে না চমকে ওঠে, কে না সেটাকে ঠেলে ঠেলে চায়। সাপেদের তো আর হাত নেই, তাদের আছে মুখ। চমকে উঠেই ব্যবহার করে ফেলবে তারা মুখ। অর্থাৎ সবাই মিলে চুম্বন দান করবে। কেয়ার গন্ধে ডুবে থাক চিরকাল, কোনও আপত্তি নেই।

কেয়া ফুলের গন্ধে ডুবে যেতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই, মানুষ পোড়ার গন্ধটা চাপা পড়ল। হীরামন হাবেলীর দোতলায় তাঁর শোবার ঘরের কোণে পড়ে রইল ডাঁই প্রমাণ বেল কাঠ, তার ওপর চুপ করে বসে রইল পঁচিশ খণ্ড আসল মৈসুরী চন্দন, ত্রিবেদী মশাই উধাও হয়ে গেলেন। ভুলেই গেলেন বোধ হয় হতভাগা কাঠগুলোকে, হাতে যেখানা ধরা ছিল, সেখানাকে অন্যমনস্ক ভাবে নামিয়ে রাখলেন যথাস্থানে। তার পর তিনি পিছিয়ে যেতে লাগলেন। পিছতে পিছতে পৌঁছে গেলেন সেই ভয়ানক পিছল ভয়ানক গড়ানে খালের কিনারায়। নামতে লাগলেন পলির মধ্যে পায়ের আঙুল বসিয়ে বসিয়ে। নামতে নামতে হঠাৎ একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন। আঙুলের কল্যাণে আটকে রইল শরীরটা, সেই অবস্থায় তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়ে যা দেখতে লাগলেন, তা দেখার কল্পনা কখনও কোনও মানুষ করতেই পারে না

দেখতে পেলেন ত্রিবেদী মশাই, একটা অদ্ভুত-দর্শন প্রাণী খুব আস্তে আস্তে জলের কিনারায় হাঁটছে।

কি ওটা!

কি সেটা বুঝতে পারার আগেই হঠাৎ সেই প্রাণীটা ছিটকে উঠল। জলের ভেতর থেকে খেলে বোধ হয় কারও ছোবল। ছিটকে উঠেই হেলে পড়ল পিছন দিকে। তখন দেখতে পেলেন ত্রিবেদী মশাই তার হাত দুখানা। দু হাত দিয়ে সরু লাঠির মত একটা কিছু ধরে আছে। সেই লাঠির মাথায় বাঁধা সুতো ডুবে আছে জলের মধ্যে, সম্ভবতঃ জড়িয়ে আছে কোনও কিছুতে। তাই পেছন দিকে হেলে পড়ে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করছে সুতোটা। টানছে, প্রাণপণে টানছে, ধনুকের মত বেঁকে পড়েছে সরু লাঠির মাথাটা। ভাঙল বুঝি মটাং করে।

ভাঙল না, ক্রমেই নুয়ে পড়তে লাগল। ক্রমেই তলিয়ে যেতে লাগল সুতোটা জলের ভেতর। হঠাৎ আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ত্রিবেদী মশাই—আটকেছে, নিশ্চয়ই বেশ বড় একটা শোল-টোল কিছু গিঁথেছে। চলতে লাগল টানাটানি। জলের ভেতর যে আছে তাকে দেখা গেল না। ডাঙার জীবটিকে অনেকটা স্পষ্ট ভাবে দেখা গেল। অস্বাভাবিক এক বোঝা চুলে ঢাকা একটি মানুষী মূর্তি। মাথার চুলে যে কারও লজ্জা নিবারণ হতে পারে, তা জানা ছিল না সেই সদ্য কাব্য পরীক্ষা দেওয়া নবীন পণ্ডিতটির। প্রায় ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থাটা তাঁর তখন, সেই অবস্থায় তিনি দেখতে লাগলেন, অনেক নীচে যা ঘটেছে। টানাটানি চলতেই লাগল জলে-ডাঙায়। বহুবার চুলের বোঝার ফাঁকে ফাঁকে ডাঙার জীবটির অনেকখানি অংশ ধরা দিলে নজরে। তার পর জলের জীবটির দর্শনও মিলল। বেশ কিছুক্ষণ টানাটানি করে ডাঙার জীবটি একটি মোক্ষম ফন্দি আঁটলে। ছিপের গোড়াটাকে গেড়ে দিলে ডাঙায়, দু হাতে ধরে কয়েকবার দমক দিতেই অনেকটা মাটির মধ্যে ঢুকে গেল। তখন সে ছুটে নেমে পড়ল জলে, প্রায় বুক সমান জলে গিয়ে দিলে ডুব। দম আটকে তাকিয়ে রইলেন

ত্রিবেদী মশাই, কয়েকটা মুহূর্ত থাকতে হল দম বন্ধ করে। তার পর জলের ওপর ভেসে উঠল এক রাশ চুল, তার পর দেখা গেল, দু হাতে একটা কাছিমকে ধরে ডাঙার জীবটি ডাঙায় উঠে আসছে।

"আসুন বড়দা, বসে পড়ুন। বড্ড দেরি হয়ে গেল আজকে—"

ভয়ানক রকম চমকে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। জলজ্যান্ত একটি কূর্ম অবতারকে চিৎ অবস্থায় নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরে এক জল-দেবী জলের ভেতর থেকে উঠে আসছে তখন। হঠাৎ ত্রিবেদী মশায়ের পা পিছলে গেল যেন, মুহূর্ত মধ্যে তিনি পড়লেন গিয়ে খালের জলে। অবোধ্য একটা শব্দ বার হল তাঁর গলা থেকে। তিনি সামলে নিলেন ধাক্কাটা। টেনে টেনে বললেন—এনেছ, বেশ—বেশ। কই—দেরি আর এমন কি হয়েছে।

মুক্তা বললে—না, দেরি আবার হয় নি। ঘুম ভাঙতেই বেলা হল কত আজ। কালঘুমে পেয়েছিল আমায়। সিনেমা দেখা না ছাই দেখা। মিছেমিছি আজ সব গোলমাল হয়ে গেল।

ত্রিবেদী মশাই আর কথা বাড়ালেন না, বেশ ব্যস্ত ভাবেই এগিয়ে এসে বসে পড়লেন আসনে। সাদা পাথরের থালা নামিয়ে দিল সামনে মুক্তা। একটু আগে একবার এসেছিল সে, এসে থালা রাখবার স্থানটুকুতে জল ছিটিয়ে মুছে দিয়ে গেছে। ত্রিবেদী মশাই টের পান নি। পাবেন কি করে, তখন যে তিনি খালের পাড়ে আটকে ছিলেন। কেয়ার গন্ধে তখন তিনি ভরপুর। কেয়ার গন্ধ কি সহজ গন্ধ নাকি!

কেয়ার গন্ধটা এবার চাপা পড়ল। সুগন্ধি আতপের গরম ভাত, তার ওপর মাখন জ্বালানো ঘি ছড়ানো হয়েছে। আলু কাঁচকলা কাঁচা পেঁপে কুমড়ো সিদ্ধ হয়েছে ভাতের সঙ্গে। বিশুদ্ধ হবিষ্যান্ন, অনন্ত-দেবকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করেন ত্রিবেদী মশাই। যখন চোখ ছিল, তখন স্বহস্তে নানা রকম ব্যান্নন প্রস্তুত করে অনন্তদেবের সামনে রেখে ভোগ দিতেন, চোখ যাওয়ার পরে ব্যবস্থা হয়েছে শুধু

হবিষ্যান্ন। মুক্তা চড়িয়ে দেয়, নামিয়ে নেয়। পাঁচ রকম করতে গেলে কতটা পবিত্রতা বজায় রাখতে পারবে, তার ঠিক নেই। তার চেয়ে শুধু হবিষ্যান্নই ভাল। ঠাকুর-ঘরেও নিয়ে যেতে দেন না সে ভোগ ত্রিবেদী মশাই। কাঁচা নৈবেদ্য নিবেদন করে নিত্য-সেবা সমাধা করেন। তার পর নিজের ঘরে বসে হবিষ্যান্ন নিবেদন করেন। খেতে তো হবেই নিজেকে, খেতে যখন হবে তখন যা খাবেন তাই নিবেদন করবেন ইষ্টদেবতাকে। ইষ্টদেবতা যখন চোখের দৃষ্টি নিয়েছেন, তখন আর তাঁর অপরাধ কোথায়!

হবিষ্যান্নের গন্ধ অন্য সব গন্ধকে চাপা দিল, হবিষ্যান্নের অপরাধ কি!

হাতে জল নিন বড়দা—মুক্তা একখানি ছোট গামলা ডান পাশে বাড়িয়ে ধরল।

ত্রিবেদী মশাই গেলাস কাত করে অল্প একটু জল নিলেন ডান হাতে, হাতখানা গামলার ওপর ধরে আঙ্গুল কটি ভিজিয়ে নিলেন। গামলা সরিয়ে মুক্তা বলল—নিন, এবার নিবেদন করুন। আমি ততক্ষণ ফলের থালাটা নিয়ে আসি। বলতে বলতে সে উঠে গেল।

এবার ভোগ নিবেদন করতে হবে ত্রিবেদী মশাইকে।

অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর ফাঁকে পৈতে নিয়ে আবার সেই রকম গেলাস কাত করে এক গণ্ডূষ জল নিলেন তিনি। বিষ্ণু স্মরণ করলেন, একবার গায়ত্রী পাঠ করলেন, শুরু করলেন নিবেদন করার মন্ত্র। এতৎ সঘৃতোপকরণং নৈবেদ্যং—

আর বেরল না।

জিভটা স্থির হয়ে গেল, নিবেদন মন্ত্রের শেষটুকু আটকে রইল জিভে, হাতের জলটুকু যথাস্থানে পড়ল না। প্রায় মিনিট খানেক সেই অবস্থায় স্থির হয়ে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, শেষে খুব লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না, অন্ধের পক্ষে অস্বাভাবিক বেগে গিয়ে বিছানায় উঠে পড়লেন।

তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লেন একেবারে, শুয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন।

ফলের থালা নিয়ে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই মুক্তা আঁতকে উঠল—একি! উঠে গেলেন যে!

শান্ত স্বাভাবিক গলায় ত্রিবেদী মশাই বললেন—আজ যে গুরুদেবের তিরোধান তিথি। ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ একটু আগে মনে পড়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল মুক্তা ভোগের থালাটার ওপর; মুখ দিয়ে আর রা ফুটল না।

হীরামন হাবেলীর দোতালার ঘরখানা বোবা হয়ে রইল। শুকনো কাঠগুলোর পেটে জ্বলন্ত ক্ষুধা, ওদের আর সবুর সয় না। ছাতের ওপর শকুনগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। জননী জাহ্নবী কয়েক দিন ওদের কৃপা করেন নি। সাদা পাথরের থালাখানা তুলে নিয়ে গেছে মুক্তা, গুরুদেবের তিরোধান তিথিটিকে মর্যাদা দেবে না, এ হেন সাহস কার আছে!

গুরুদেবের তিরোধান তিথিতে ত্রিবেদী মশায়ের ঘুমও তিরোধান করেছে। জেগে আছেন তিনি। ইষ্টদেবতা অভুক্ত থেকে গেলেন। ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছেন অনন্তদেব। উপায় কি! নিবেদনের মন্ত্র কিছুতে বেরল না মুখ দিয়ে। হীরামন হাবেলীর নীচের তলায় ফিস-ফিসানি তাঁর জিভ টেনে ধরল। খবরদার, কোন্ হাতের রান্না ভোগ তুমি নিবেদন করছ!

ক্ষুধার কিন্তু জাত নেই। ক্ষুধা কি বস্তু, তা ত্রিবেদী মশাই জানেন। ক্ষুধার উলঙ্গ রূপ তিনি দেখেছেন। জ্যান্ত কাছিমটাকে চিৎ করে ফেলে লম্বা ছোরা দিয়ে চাকা চাকা মাংস তুলে নিচ্ছে তার দেহ থেকে, আর তৎক্ষণাৎ আগুনে ঝলসে নিয়ে মুখে পুরছে এই জাতের ক্ষুধার—

কি জাত, তা কি বলতে পারে কেউ! টিনের বেড়ার গায়ে মুখ বুক পেট লেপটে দাঁড়িয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই, শ্রাবণ রাতের আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে তখন, হুড়হুড় করে জল পড়ছে পিঠে। পড়ুক, বৃষ্টিতে কেউ মরে না, ক্ষুধার জ্বালায় মরে। ইস্—কি ক্ষুধা! কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা! কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ছোরা দিয়ে কাটছে, আগুনে সেঁকছে, মুখে পুরছে, আস্তে আস্তে চিবচ্ছে, গিলে ফেলছে। এক মনে করে যাচ্ছে নিজের কাজ, কোনও দিকে নজর দেবার ফুরসত নেই। মাত্র তিন হাত সামনে টিনের বেড়ার ওপিঠে দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিবেদী মশাই, ছোট্ট একটা ফুটোয় একটা চোখ লাগিয়ে দেখছেন। তখন তাঁর চোখ ছিল, তখন তাঁকে মনের চোখ দিয়ে দেখতে হত না।

ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখবার আশায়, সেই সর্বনাশী ক্ষুধার সাকার রূপের চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়ার জন্যে অলক্ষিতে তার পিছু পিছু গিয়েছিলেন কি তিনি খালের পাড় থেকে! কেন গিয়েছিলেন!

কেন যে গিয়েছিলেন, তা তিনি আজও নিজেকে নিজে বোঝাতে পারেন নি। কেন যে আড়িপেতে আগাগোড়া সবটুকু দেখেছিলেন তার জবাব কে দেবে!

ক্ষুধা, ক্ষুধা—ঐ দেখাটাও এক জাতের ক্ষুধা। দেখার ক্ষুধায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে। দেখতে দেখতে নাড়িভুঁড়িতে মোচড় দিয়ে উঠেছিল, গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল বমি, তবু তিনি সরতে পারেন নি, ফুটোটা ছেড়ে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারেন নি। তাঁকে একটা অন্য জাতের ক্ষুধায় গ্রাস করেছিল তখন। কোনও জাতের ক্ষুধার হাত থেকে কোনও মতেই রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। সব ক্ষুধাই সমান, চোখের ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা, ক্ষুধা মাত্রেরই জাত নেই। ক্ষুধা কোনও বাছবিচার মানে না। সত্যিকারের ক্ষুধা নির্বিচারে সমস্তই গিলে ফেলতে থাকে।

অভুক্ত রইলেন ইষ্টদেবতা, ক্ষুধা নিয়ে বসে রইলেন। ক্ষুধার জ্বালায় ইষ্টটুকুই হয়তো গ্রাস করে ফেলবেন !

তাই তো হল। শেষ পর্যন্ত নিজের গায়ে এক বোতল কেরোসিন ঢেলে আগুনে ঝলসে ক্ষুধার মুখে তুলে দিলে নিজেকে হতভাগী। লোকে বললে—যাক্, বাঁচল রসরাজ ভরদ্বাজের বউটা, বেঁচে থাকার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেল।

লোকে জানে কি ! কতটুকু জানে ! রাতের পর রাত সেই টিনের ফুটোয় চোখ দিয়ে যা দেখেছেন ত্রিবেদী মশাই, তার শত ভাগের এক ভাগ জানলেও অমন কথা বলত না কেউ। কার কতটুকু সংবাদ রাখে লোকে। ভাগ্যে রাখে না। কার কি সত্যিকারের পরিচয়, সেটুকু নজরে পড়লে নজর গলে জল হয়ে যেত, যেমন চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর হয়েছে।

হাঁ—তাই-ই হয়েছিল। অন্ধ হয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই অনেক দিন আগেই। টিনের বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে রাতের পর রাত জেগে থাকার ফলে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার পর থেকে আর কিছুই দেখেন নি। মানে কপালের ওপর চোখ ছুটো থাকলেও দেখবার শক্তিটা ছিল না। চোখ থাকলেই কি দেখা যায় ! চোখ থাকলে যা দেখা যায়, তা দেখে শুধু ঠকতে হয়। চোখ হল ঠকাবার যন্ত্র, চোখের মত নিমকহারাম ঠগ জোচ্চোর আর কে আছে ! চোখের মাথা খেলে আর ঠকবার ভয় থাকে না। সাদাকে কালো, কালোকে সাদা দেখবার জন্যে চোখ ছুটোই দায়ী। চোখের মত শত্রু আর কে আছে !

চোখের পাল্লায় পড়ে ত্রিবেদী মশাইও মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। জ্যান্ত কাছিমের মাংস কেটে গেলবার ক্ষুধাটায় আহুতি দিতে শুরু করেছিলেন। ভরদ্বাজের বউকে আর কাছিম ধরবার জন্যে নামতে হয় নি খালে। ভেজবার ভয়ে একমাত্র সম্বল পরনের ছেঁড়া কাপড়-

খানকে কূলে রেখে শুধু চুলের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে জলে নামতে হয় নি। ভাত কাপড় আর সেই চুলের বোঝার জন্যে তেল পৌঁছে দিতে শুরু করেছিলেন ত্রিবেদী মশাই। দিয়েই সুখ, দেওয়ার বদলে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা তাঁর ছিল না।

সত্যিই ছিল না।

তবু কিন্তু রোজ রাত্রে চোরের মত লুকিয়ে বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে। অর্ধেকটা রাত জেগে বসে থাকতেন একটা ফুটোয় চোখ রেখে। বেত কাঁটায় শরীরের চামড়া ফালাফালা হয়ে ছিঁড়ে যেত, মশার কামড়ে হাত পা মুখ ফুলে উঠত, দুর্গন্ধে দম আটকে আসত। কিছুতেই নড়তেন না। কেরোসিনের টেমির ধোঁয়ায় বোঝাই ঘর খানার ভেতর আলোর বালাই থাকতই না বলা চলে। স্পষ্ট ভাবে কিছুই দেখা যেত না, শুধু আন্দাজ করা যেত। কালি বর্ণ দুটো শরীর নড়ছে চড়ছে। কখনও এক হয়ে মিশে যাচ্ছে, কখনও আলাদা হচ্ছে। হন্যে হয়ে ওঠা দুটো হিংস্র প্রাণী নিঃশব্দে নড়ছে যেন, একে অপরকে না খেয়ে কিছুতে ছাড়বে না।

ক্ষুধা, আর এক জাতের খুনজোশী ক্ষুধা—ত্রিবেদী মশাই নিজের শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু একটি মাত্র চক্ষে জমা করে সেই ক্ষুধার পানে তাকিয়ে থাকতেন। মশার কামড়ে করবে কি তাঁর তখন, কেউটে সাপের ছোবলেও বোধ হয় কিছু করতে পারত না।

তার পর একটা মূর্তি ঘর ছেড়ে চলে যেত। আগড়টা একটু ফাঁক করে চোরের মত চুপি চুপি পালাত। ঘর থেকে দশ পা ফেললেই পাট খেত। পাট খেত ছুঁতে পারলে আর পায় কে! স্বয়ং যমও খুঁজে পাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে টেমিটা নিভে যেত, চোখ বুজে ফেলত ঘরখানা। ত্রিবেদী মশাইও পাট খেতে নামতেন, বুক ভরে নিঃশ্বাস টানতেন, অতটা সময় দম আটকে থাকবার ফলেও বুকখানা ফাটে নি দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তার পর বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে শুয়ে আবার

মনের চোখটাকে চেপে ধরতেন একটা ফুটোয়, মনের চোখ ছুটোর হাত থেকে সহজে নিস্তার পেতেন না।

নিস্তার নেই। অভুক্ত অনন্তদেব—তাকিয়ে রয়েছেন আগুন জ্বলে উঠেছে তাঁর দৃষ্টিতে! না কিছুতেই নিস্তার নেই।

নিস্তার কি সহজে মেলে!

ক্যাঁ—কোঁচ—অল্প একটু আওয়াজ হল, কপাট ঠেলে ঢুকল বুঝি কেউ ঘরে। জ্বালালে দেখছি, শান্তিতে শুয়ে থাকতেও দেবে না।

সাড়া দিলেন ত্রিবেদী মশাই—কে? কে এলে ঘরে?

আমি—আমি বিপুল। বিপুল বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলে।

বিপুল! বাঃ—বিপুল বিস্ময়ে ত্রিবেদী মশায়ের স্বর আটকে গেল।

বিপুল বললে—আজ্ঞে হাঁ, আপনার কাছে এলাম। এ সময় কেউ থাকে না আপনার কাছে, তাই এলাম। খুবই মুশকিলে পড়ে গেছি, একটা পরামর্শ, মানে আপনার উপদেশ না পেলে, মানে—

ত্রিবেদী মশাই বিপুল আগ্রহে উঠে বসলেন। বললেন—বল না, বল বল। মুশকিলে পড়েছ, সে তো খুবই ভাল কথা। মুশকিলে না পড়লে এ সময় আসবে কেন? আপিস কামাই করেছ—পরামর্শ নেবার জন্যে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর। বল—শুনি তোমার সঙ্কটটা। দেখা যাক, কি পরামর্শ দেওয়া যায়।

কেশে গলা পরিষ্কার করে বিপুল বললে—আজ্ঞে ভারী একটা হাঙ্গামা বেধেছে। আমায় এবার বিয়ে করতে হবে দেখছি।

বিয়ে করতে হবে! বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে আর একবার উচ্চারণ করলেন ত্রিবেদী মশাই—বিয়ে করতে হবে!

বিপুল বেচারা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ল। গলাটা বেশ খাটো করে বলল—আজ্ঞে, তাই তো দেখছি। বিয়ে না করে আর উপায় নেই। ভারী একটা ইয়েতে পড়ে গেছি। মানে—বিধবা কি না, সবাই বাধা

দিচ্ছে। এধারে আবার খুবই পেড়াপীড়ি লাগিয়েছে, কিছুতেই—

ত্রিবেদী মশাই বাকীটুকু বলে ফেললেন—ঠেকানো যাচ্ছে না। উত্তম, অতি উত্তম কথা হে বিপুল। আমি বলছি, এ বিয়ে হবে। আমি নিজে চেষ্টা করব। বিয়ে করবে, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। কথাটা আগেই আমায় জানানো উচিত ছিল। না না, আগেই বা জানাবে কেমন করে, কথা পেলে তবে তো জানাবে। বিয়েতে দু পক্ষেরই সম্মতি চাই যে। যাকে বিয়ে করবে, তার মতামতটাই আসল ব্যাপার। সেটুকু যখন পেয়েছ—

তাড়াতাড়ি বিপুল বলে উঠল—আজ্ঞে হাঁ, পাত্রীর পেড়া-পীড়িতেই—

ত্রিবেদী মশাই খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—অতি সৎ মেয়ে। অন্য কেউ হলে শুধু ফুর্তি করেই সন্তুষ্ট থাকত। দেখছ তো আজকাল, চারিদিকে কি ঘটছে, দেখছ তো। কুমারী সধবা বিধবা সকলেই মজা লুটতে চায়। বিয়ের কথা তুলতে গেলেই বেঁকে বসবে। কেন যাবে একটা পুরুষের কাছে বন্দিনী হতে। ব্যভিচার ব্যাপারটাকে ব্যভিচার বলেই মনে করে না কেউ। আর এ মেয়ে বিয়ে করার জন্যে পেড়াপীড়ি লাগিয়েছে। অতি সাধু সঙ্কল্প, আমি নিজে চেষ্টা করব যাতে এ বিয়ে হয়। কে বলেছে হবে না ? কার কতখানি শাস্ত্রজ্ঞান আছে ? যেখানে দুটি হৃদয়ের মিলন হয়েছে, সেখানে কোনও বাধা থাকতে পারে না। যাও—তুমি, ব্যবস্থা কর গে। শাস্ত্রসম্মত ভাবে আমি নিজে বসে বিয়ে দোব। দেখি, কে কি করতে পারে।

বিপুল বোধ হয় এতটা আশা করে আসে নি। পরম কৃতার্থ হয়ে পড়ল একেবারে, বলে গেল—আজ্ঞে, এবার আমার বুকে বল এল। আমি—আসি এখন, কাল আবার আসব এই সময়। এইবার সমস্ত ব্যবস্থা করি গিয়ে। আপনার মতটা পেয়ে গেলাম, আর আমার ভয় কি ?

ত্রিবেদী মশাই আর কিছু বললেন না, বলবার আর আছেই বা

কি? বেশী বলা মোটেই বলার মত বলা নয়। একেবারে মুখ টিপে থেকেও অনেক কিছু বলা যায়। মৌন হয়ে থাকা—অনেক ক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়ার লক্ষণ। আবার অনেক ক্ষেত্রে মৌন হয়ে থাকাটা খুবই ভয়ঙ্কর।

অভুক্ত অনন্তদেব মৌন হয়ে আছেন। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠলেও মৌন হয়েই থাকবেন। থাকতেই হবে যে, কে রাঁধবে ওঁর ভোগ! অশুচি অবস্থায় ভোগ রাঁধলে সে ভোগ কি করে নিবেদন করা যায়! নিবেদন করলেও কি উনি গ্রহণ করবেন!

ভয়ানক রকম শিউরে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। ইস্! করেছেন কি তিনি! দিনের পর দিন নিশ্চিন্ত হয়ে ভোগ নিবেদন করেছেন ইষ্টদেবতাকে। ইষ্টদেবতা গ্রহণ করেন নি। অভুক্ত ইষ্টদেবতা মৌন হয়ে আছেন।

ক্ষুধা, নিদারুণ ক্ষুধা, দেবতার ক্ষুধা বড় ভয়ানক। দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি সহজে হয় না।

মানুষেরও না।

ঠিক ভাবে, শাস্ত্রসম্মত শুচিতা রক্ষা করে শাস্ত্রসম্মত খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করলে দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় কি না কে জানে, মানুষের বেলা কিন্তু একেবারে উলটো ফল ফলে। যত খায়, ততই ক্ষুধা বাড়ে মানুষের। বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত মানুষটাকেই গ্রাস করে। রসরাজ ভরদ্বাজের তাই হল। তার ক্ষুধা তাকে খেয়ে তবে শান্তি পেলে।

ক্রমেই ভরদ্বাজের সাহস গেল বেড়ে, সন্ধ্যার পরেই সেঁদোতে লাগল ঘরে। ত্রিবেদী মশাই তো আর সন্ধ্যার পরেই রওয়ানা দিতে পারতেন না, নিজের দিকটাও রক্ষা করা চাই। বাড়ি নিঝুম হলে তবে তিনি চুপি চুপি পালাতেন। পৌছতেন যখন যথাস্থানে, তখন

ফুটোয় চোখ দিয়ে নিরাশ হতেন। ঝড় ঝঞ্ঝা তুফানের চিহ্ন মাত্র নেই ঘরে, দুটি প্রাণী পাশাপাশি শান্তিতে শুয়ে আছে। কিংবা হয়তো দেখলেন, ভরদ্বাজ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে আর বউটা তার গা ঘেঁষে বসে টেমির শিস্‌টার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। রেগে উঠতেন ত্রিবেদী মশাই। কি আপদ দেখ! শুয়ে ঘুমোবার জন্য আসে নাকি লোকটা! ভারী মজা পেয়ে গেছে তো! আসছে খাচ্ছে ঘুমচ্ছে! এক ঘুম দিয়ে উঠে ধীরে সুস্থে প্রস্থান করছে, কোনও চিন্তা নেই। খাবার রসদ কোথা থেকে জুটছে, তা নিয়ে মোটে মাথা ঘামায় না। অপদার্থ আর কাকে বলে!

শুধু শুধু মশার কামড় খাওয়া আর দাঁড়িয়ে থাকা, কাঁহাতক ধৈর্য থাকে মানুষের। ত্রিবেদী মশাই হাত গুটোলেন। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন শুধু হাতে। রসরাজের বউ এসে কিছুই পেল না। ত্রিবেদী মশাই একান্ত দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, বাড়িতে খুবই গোলমাল হচ্ছে। চাল ডাল নুন মশলা কেন ফুরিয়ে যায় তাড়াতাড়ি, তা নিয়ে কথাবার্তা উঠেছে। কি করবেন তিনি, তাঁর দ্বারা বোধ হয় আর কোনও উপকারই হবে না।

শুনে রসরাজের বউ মাথা নুইয়ে কি যেন একটু ভেবে নিলে। মুখ তুলে তাকাল যখন আবার ত্রিবেদী মশায়ের চোখের দিকে, তখন তিনি বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আশা করেছিলেন, চোখ দুটিতে দুর্ভাবনার ছাপ পড়বে।

আবার উপোস করতে হবে, এ সংবাদটা শুভ সংবাদ নয়। কিন্তু না, রসরাজ ভরদ্বাজের বউ মোটেই ঘাবড়াল না। মনে হল, চোখ দুটো তার বেশী রকম চকচক করছে। বললে—তাই তো ঠাকুর, ঘরে যে কিছুই নেই। আজ থেকে আবার সে অনেকটা রাত করে আসবে বলে গেল। নিষুতি না হলে নাকি বিপদ ঘটতে পারে। আমিও তাই বললাম, যাই হোক তবু এক বার এক মুঠো খেতে তো পাচ্ছে, তা খানিক রাত হলেই বা দোষ কি। বেশী রাতে খেলে দিনের বেলায়

খিদে পাবে না। জেগে বসে থাকতে হবে আমাকে একলা, থাকব। উপোস করে থাকতে হবে না, কাঁচা মাছ জ্যান্ত কাছিম খেয়ে বাঁচতে হবে না। হক না রাত, বিপদ না ঘটলেই হল।

তৎক্ষণাৎ ত্রিবেদী মশাই ঠিক করে ফেললেন, বিপদ ঘটতে দেবেন না। বসে থাকতে বললেন ভরদ্বাজের বউকে সেখানেই। যাবেন আর আসবেন, কোনও চিন্তা নেই। বিপদ তিনি কিছুতে ঘটতে দেবেন না। রাত করে এসে কিছুই খেতে পাবে না ভরদ্বাজ, এটা একটা কাজের কথা নাকি! রসদ তিনি জোটাবেন, ঠিক জুটিয়ে যাবেন রসদ। সন্ধ্যার পরেই ঘরে ঢুকে ভরদ্বাজ যদি বিপদ না ঘটায়, তা হলেই হল।

সে দিন রাত্রে নিজের বাড়ি নিষ্কৃতি হলে যথাস্থানে পৌঁছে ত্রিবেদী মশাই খুশী হলেন। ভরদ্বাজ তখনও আসে নি। একটু পরে সে এল। আসবার সঙ্গে সঙ্গে বউটা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে। দম আটকে বেড়ার ফুটোয় চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিবেদী মশাই। কি কাণ্ড দেখ! পাগল হল নাকি ওরা! খাওয়া-দাওয়া করবে না!

তার পর আর কোনও দিন মনেই হয় নি ত্রিবেদী মশায়ের যে রসদ যোগানো অসার্থক হচ্ছে।

বিপদটা ঘটে গেল কিন্তু রসদের জন্যেই। ক্রমেই মানুষের ভুরু কোঁচকাতে লাগল। কই, রসরাজ ভরদ্বাজের বউটা ছেঁড়া কানি পরে খাল-বিলের ধারে ঘুরে বেড়ায় না তো আর! বনে জঙ্গলে সেঁদিয়ে মাটি খুঁড়ে কচু-ঘেঁচু খোঁজে না! তা হলে!

তার পর আরও একটু নজর ফেলতেই বুঝতে পারল সবাই, ভরদ্বাজের বউ মাথায় তেল দিচ্ছে। ভরদ্বাজের বউ কানি পরে রুক্ষ চুলের আড়ালে দেহটা ঢেকে বেড়াচ্ছে না। চুলগুলোকে বিঁড়ে পাকিয়ে মাথার পেছনে আটকেছে। মোটেই বে-আবরু হয় নি তাতে, কারণ পরনের কাপড়খানায় গিঁট পড়ে নি। নজর রাখতে রাখতে শেষ

পর্যন্ত জেনে ফেলল সবাই, ভরদ্বাজের বউ বসন্ত সাধুর দোকান থেকে পান কেনে দোক্তা পাতা কেনে। মানুষের নজর আরও তীব্র হল।

অবশেষে সর্বনেশে রাতটা সমুপস্থিত হল।

পৌষ মাস, কুয়াসায় ঢেকে গেছে গ্রামখানি। কালো চাদর মুড়ি দিয়ে উপস্থিত হলেন ত্রিবেদী মশাই যথাসময়ে, যথাস্থানে চোখ দিয়ে দাঁড়ালেন। ওরা তখন খাচ্ছে। হঠাৎ যেন মনে হল ত্রিবেদী মশায়ের কারা এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে। আর একটু হলেই তিনি চেঁচিয়ে উঠতেন। সে সুযোগ আর পেলেন না। এক সঙ্গে পাঁচ ছটা মানুষ চেপে ধরল ওদের পেছন থেকে। টুঁ শব্দটি হল না, চক্ষের নিমেষে কার্য সুসম্পন্ন হল। একটা মাল তুলে নিয়ে চলে গেল তারা, আর একটা পড়ে রইল। বেড়ার গা থেকে সরে গিয়ে বেতের ঝোপে গুড়ি মেরে ঢুকলেন ত্রিবেদী মশাই। কে জানে, বেটারা যদি ঘরের পেছনে এসে পড়ে!

বেটারা তা যায় নি। তারা তাদের রাস্তায় চলে গিয়েছিল। অনেক-ক্ষণ পরে ত্রিবেদী মশাইও নিজের পথ ধরেছিলেন। তখন তাঁর বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। রসরাজ ভরদ্বাজের ঘরখানার দিকে ফিরেও তাকান নি। সোজা বাড়ি ফিরে কাঁথার তলায় আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। পরোপকার করার শখ তখন তাঁর রক্তের ভেতর থেকে নিঃশেষে নিঃসৃত হয়ে গেছে। পরোপকার করতে গিয়ে খুনখারাপির ভেতর জড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল। খুবই বেঁচে গেছেন। ভূতের বেগার খেটে মরছিলেন। ভূতটা তাঁর কাঁধ থেকে নেমে গেল।

ক্ষুধাটা কিন্তু মিটল না। ঠিক বেঁচে আছে। ফুটোয় চোখ দেবার প্রবৃত্তিটা ঠিক বেঁচে আছে। চোখ দুটো গলে জল হয়ে গেছে, তবু রেহাই নেই। তবু এখনও ফুটো দেখলেই ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে পড়েন। কপালের চোখ দুটো গেছে, কিন্তু মনের চোখ দুটো আছে। মনের গায়ে যে ফুটো আছে, তাতে উঁকি দেয়। সমস্ত মনটার গায়েই ফুটো,

কুৎসিত রকমের ফুটো হয়ে গেছে তাঁর সারা মনখানায়। ছেঁড়া কাপড়, ভরদ্বাজের বউ যে রকম কাপড় পরত, সেই রকম দশা হয়েছে তাঁর মন-কাপড়খানায়। ইস্—ঐ মন দিয়ে কি আর লজ্জা নিবারণ হয়!

আর এক বার তাঁর মন তাঁকে বেইজ্জত করল।

ঘর থেকে বেরিয়েই ধাক্কা খেল মুক্তা তাঁর বুকের সঙ্গে। কি ভাবল সে! বুড়ো ভামটা আড়ি পেতে আছে, বুড়োটার হুঁশ জ্ঞান নেই। ঘরেতে এক গাদা কাঠ রেখেছে পুড়বে বলে তবু এখনও হ্যাংলা-পনা ঘুচল না। এই সমস্ত ভেবে খুব খানিক হেসে নিল নিশ্চয়ই। বিপুল এসেছে, বিপুলের সঙ্গেও নিশ্চয়ই হাসাহাসি করবে বুড়োটার হ্যাংলাপনা নিয়ে। বেইজ্জতের একশেষ একেবারে—ছিঃ—

বেইজ্জত কিছু কম হন নি ভরদ্বাজদের কাছেও। কি ভাবে তাঁর ইজ্জতটুকু নিঙ্ড়ে নিঙ্ড়ে ওরা ওদের বাঁচবার রসদ জোটাচ্ছিল, সেটা যেদিন টের পেলেন, সেদিন গলা পর্যন্ত গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে ছিলেন না, তাই গঙ্গায় তলিয়ে যাবার কথাটা মনে হয় নি। কি আর একটা কথা মনে মনে তিনি জননী ধরিত্রীকে জানিয়েছিলেন। ভরদ্বাজের বউটার দুটো জ্বলন্ত চক্ষুর আঁচ থেকে বাঁচবার জন্যে ধরিত্রীর কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন মনে মনে, হাঁ করে তাঁকে গ্রাস করবার জন্যে। ধরিত্রী দ্বিধা হয় নি, পায়ের তলার মাটি পায়ের তলায় পড়ে নিঃশব্দে হাসছিল তাঁর দশা দেখে। দু হাত দূরে দাঁড়িয়ে ভরদ্বাজের বউ হিসহিস করে বলছিল—খুব সাবধান ঠাকুর, কিছুতেই যেন কারও কাছে বলে ফেল না কোন কথা। সেদিন রাত্রে কি ঘটে-ছিল ঘরের ভেতর, কেউ যেন না জানতে পারে। জানাজানি হলে আমাকেও তারা মেরে ফেলবে।

ত্রিবেদী মশাই পাশ কাটিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিলেন। আকাশ

থেকে পড়া সুর ফুটিয়ে তুলেছিলেন গলায়—কবে। কোন্ ঘরের ভেতর কি ঘটেছিল!

ভরদ্বাজের বউ যেন শুনতেই পায় নি তাঁর কথা। আপন মনেই বলে যেতে লাগল—খুব ভাল কাজ করেছিলে চুপচাপ পালিয়ে এসে। যখন জ্ঞান হল আমার, তখন বড় ভয় হল। হয়তো তুমি গ্রামের লোককে সব বলে দেবে। তার পর হিসেব করে বুঝে দেখলাম, তা তুমি পারবেই না। রোজ রাতে বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে থাক ফুটোয় চোখ দিয়ে, এ কথাটা লোককে জানাতে পারবে না কিছুতেই। মুখ বুজে থাকতেই হবে তোমাকে। তবু সাবধান করা দরকার, তাই আজ এলাম এখানে। নয় তো আসতাম না। আর তো আমার চাল-ডালের দরকার নেই। যার জন্যে নিতাম তোমার চাল-ডাল, সে গেছে। পুলিসে ধরতে পারলে মেরে ফেলত না, জেল হত। এরা একেবারে নিকেশ করে ফেলবে। সেই রাত্রেই নিকেশ করেছে। পুলিসের হাতে পড়লে পাছে কোনও কথা ফাঁস করে ফেলে, এই ভয়ে এরা কিছুতেই তাকে বাঁচতে দেয় নি। চিরকালের মত তার মুখ বন্ধ করেছে। তুমিও মুখ বন্ধ করে থাক ঠাকুর, আমিও মুখ টিপে থাকি। নয় তো আমাদেরও তারা শেষ করবে।

ধরিত্রী যখন কিছুতেই হাঁ করল না, তখন ত্রিবেদী মশাই আবার হাঁ করলেন। বললেন—নাও, আজকের মত অন্ততঃ নিয়ে যাও এগুলো। এনেছি, ফিরিয়ে নিয়ে যাব কেমন করে!

অদ্ভুত জাতের একটু হাসি ফুটে উঠেছিল ভরদ্বাজের বউটার চোখে। বলেছিল—কেন দেবে? দাম দোব কেমন করে আমি? এখন বেড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে কি দেখবে তুমি রোজ রাতে? আর তো সে ফিরবে না।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ান নি সেখানে ত্রিবেদী মশাই, তৎক্ষণাৎ লাগিয়েছিলেন দৌড়। একটা জ্যান্ত কালকেউটে যেন ছোবল দিয়েছিল তাঁর মুখের ওপর। মুখের জ্বালায় পাগল হয়ে ছুটে পালিয়ে এসে-ছিলেন।

সেই ছোবল আবার তাঁকে খেতে হল এতদিন পরে। বুক সমান জলে দাঁড়িয়ে ডুব দিচ্ছিলেন, সেইখানে গিয়ে কালকেউটেটা তাঁর ঘাড়ে ছোবল দিল। হঠাৎ কানে গেল—উঠুন, উঠে আসুন বড় দা। করছেন কি! একশটা ডুব দেওয়া হল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেল আমার—। শেষ পর্যন্ত নামতেই হল জলে। স্নান হয়ে গেল আমার, এখনও আপনার ডুব দেওয়া শেষ হল না। কি পাগলামিতে পেয়েছে আপনাকে। জ্বর না এনে উঠবেন না বুঝি!

সোজা ধমকানি, সহজ পন্থায় জোরজবরদস্তি করা, দুষ্ট ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জল থেকে তুলে আনে যেমন ভাবে, তেমনি ভাবে তাঁকে জল থেকে উঠিয়ে এনেছিল মুক্তা। তিনি শুধু আড়ষ্ট হয়েছিলেন। ভরদ্বাজের বউ তাঁকে ঠিক এই ভাবেই দেখত! ঠিক মুক্তার মত চমৎকার সহজ সরল ব্যবহার করত। ভরদ্বাজ উপোস করে থাকবে যদি সে একটা হ্যাংলা লোকের হ্যাংলাপনা বরদাস্ত করতে না পারে। খুবই নিরীহ জাতের হ্যাংলাপনা, এমন সাহস নেই যে গায়ে হাত দেবে। শুধু আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখের ক্ষুধা মেটাবে। মেটাক, ঐটুকুতে সন্তুষ্ট হয়ে রসদ জোটাচ্ছে। আহা বেচারা, কি কষ্টই না পায় রোজ রাতে বেড়ার ওপিঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অত কষ্ট করে যদি একটু শান্তি পায় তো পাক, কি এমন ক্ষতি হবে তাতে! রসদ যোগানো বন্ধ করলে কিন্তু ক্ষতির অবধি থাকবে না।

ওরা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে কৃপা করত। কৃপারই মত অনেকটা, কিংবা একথাও বলা চলে আবদার সহ্য করত। আবদেরে আদুরে খোকার বায়না—ঐ বায়নাটুকু সইতে পারলে যখন উপোস করার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়, তখন সহ্য না করে উপায় কি!

মুক্তা আর বিপুলও মনে করবে, আদুরে খোকার বায়না। খোকার খোকাপনা মনে করে গায়ে মাখবে না। কি লাভ গায়ে মেখে, তার চেয়ে হ্যাংলা খোকাটিকে হাত করে বিয়েটা যদি হয়ে যায় নির্বিঘ্নে, তা হলে একটা কাজ হয়। সেই চেষ্টাই করতে এসেছিল বিপুল, ঠিক

বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। যে মানুষ আড়ি পেতে আরাম পায়, সে কি কখনও কোনও অন্যায়কে বাধা দিতে পারে! যে মানুষের মনের জিভ লকলক করছে এক হাত, সে কি করে অপরের লকলকে জিভ টেনে ধরবে! বরং সাহায্য করবে। ভয় আছে যে, ভয়ে মুখ বুজে থাকবে, হ্যাংলাপনার কথাটা যদি প্রকাশ হয়ে যায়।

কিছুই হয় নি যেন, এইটুকু দেখাতে পারলেই হল। মুক্তাও তাই করলে। গঙ্গা থেকে তুলে এনে পূজায় বসালে, পূজার যোগাড় করে দিলে, ভোগ রাঁধলে, ভোগের থালা সামনে ধরে দিলে। নিখুঁত ভাবে করে গেল সমস্ত, যেন কিছুই হয় নি, কিছুই সে জানে না। ত্রিবেদী মশাইও প্রাণপণে 'কিছুই হয় নি' ভাবটা বজায় রাখলেন। কিন্তু ভোগ নিবেদন করার সময় মন্ত্রটা আটকে গেল। মাশুক মজলিসের রহস্যময় ফিসফিসানি ফিসফিস করে বলতে লাগল তাঁর কানে—"করছিস কি! কি করছিস? কি নিবেদন করছিস ইষ্টদেবতাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট দেখতে পেলেন ত্রিবেদী মশাই অনেক কিছু। টিনের বেড়ার ফুটোয় চোখ দিয়ে রাতের পর রাত যা দেখতেন, সব দেখতে পেলেন। ঘিনঘিন করে উঠল গা, বমি উঠে আসার উপক্রম একেবারে। ভরদ্বাজের বউটা স্নান করে এসে ভোগ রেঁধে দিলে সে ভোগ কি তিনি দেবতাকে নিবেদন করতে পারতেন!

অসম্ভব!

দেবতা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সামনে ভোগের থালা সাজানো রয়েছে, তবু তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হল না। ঘৃণার পরশে পবিত্র করে দেবতাকে ভোগ নিবেদন করা যায় না। ঘৃণা বাসা বেঁধেছে বুকের মধ্যে, অন্তর্যামী অনন্তদেব সেইখানেই বাস করেন। কি করে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যাবে।

বুকের মধ্যে ক্ষুধায় অধীর হয়ে উঠেছেন অন্তর্যামী অনন্তদেব।

কি দিয়ে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে?

বড়দা—

খুব চাপা একটু শব্দ যেন কানে গেল। ছিঁচকাঁদুনে দেবতার কান্নাটা স্তব্ধ হল বুকের মধ্যে। সতর্ক হলেন ত্রিবেদী মশাই, এবার যেন শব্দটা না ফসকে যায়।

বড়দা—

আবার সেই কুণ্ঠিত কণ্ঠের ডাক। সত্যিকারের ডাক, মনের কারসাজি নয়। একটুও না চমকে, গলায় এতটুকু চাঞ্চল্য ফুটতে না দিয়ে সাড়া দিলেন ত্রিবেদী মশাই—বল।

সন্ধ্যা হয়ে এল, উঠুন এবার—

ত্রিবেদী মশাই একটু কেঁপে উঠলেন। সাদাসিদে সাধারণ কয়েকটি কথা—সন্ধ্যা হয়ে এল, উঠুন এবার—কথাকটির মধ্যে কোনও রহস্য নেই। কিন্তু—

ত্রিবেদী মশায়ের মনে হল, কথাকটির মধ্যে অনেক কথাই যেন লুকিয়ে আছে। যেটুকু বলা হল, তার চেয়ে অনেক বেশী না বলা রয়ে গেল যেন। কি সেটুকু!

উঠুন বড়দা। একটি বার আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কোনও দিন আর দেরি হবে না উঠতে, কোনও দিন আর— চাপা ফোঁপানিতে বাকিটুকু ফুটতেই পারল না।

অস্থির হয়ে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই, উঠে বসলেন ধড়মড়িয়ে। ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলেন—দেখ, কি পাগল দেখ! কিসের দেরি! দেরি আবার হল কোথায়! আচ্ছা মুশকিল তো!

একটুখানি সময় লাগল ফোঁপানিটা সামলাতে, গলায় কিন্তু কান্নাটা আটকে রইল। সেই কান্নার ভেতর দিয়ে ছেঁকে বেরতে লাগল—ফিরতে রাত বারটা বেজে গেল। রগ দুটো তখন ছিঁড়ে পড়ছে। সিনেমা না ছাই, ওই ছাই-পাঁশ দেখতে গেলেই আমার মাথা ধরে। শেষ রাত পর্যন্ত ছটফট করে মলুম। কাল-ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি রোদ উঠে গেছে। ছুটে বেরোলাম ঘর থেকে, ঘর বারান্দা কলঘর

সব খোঁজা শেষ হল। ছুটলাম নীচে, নীচেও দেখতে পেলাম না। বাইরের উঠোন, ঠাকুর-ঘর, না কোথাও নেই। তখন দম আটকে এসেছে, কি সর্বনাশ হয়েছে কে জানে? পা আর ওঠে না, চোখে অন্ধকার দেখছি—কোনও রকমে ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। এক গলা জলে দাঁড়িয়ে তার ওপর তার ওপর ডুব দেওয়া হচ্ছে তখন। দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তখনই বুঝেছিলাম, শাস্তি আমায় পেতেই হবে।

শাস্তি! আঁতকে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই।

হ্যাঁ, শাস্তি নয় তো কি? বাড়া ভাত ফেলে রেখে শুয়ে পড়লেন, সারাটা দিন জল স্পর্শ করলেন না, আর কি শাস্তি দেবেন আমায় দিন। সব সহ্য করব মুখ বুজে, সব—সুস্পষ্ট কান্নায় গলা ভেঙে পড়ল।

বোবা হয়ে বসে রইলেন ত্রিবেদী মশাই, এক চুল নড়তে পর্যন্ত পারলেন না।

গেল, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল সব জঞ্জাল। ঝলমল করে উঠল অন্তরটা, স্পষ্ট দেখা গেল সেখানে অনন্তদেবের হাসি। ক্ষুধায় ক্ষুব্ধ নন, তৃপ্তিতে প্রসন্ন। প্রসন্ন দেবতা মুখ টিপে হাসছেন।

তা হলে!

খুবই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। বার বার নিজেকে শুধাতে লাগলেন—তা হলে! তা হলে?

আর এক বার কান্নায় ভেজা গলাটা কেঁপে উঠল—এখনও কি সাজা দেওয়া শেষ হল না আমায়! বলুন, কি করলে আপনার রাগ পড়বে? বলুন, এখুনই তাই করব। বলুন—

ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। বললেন—আঃ কি পাগলামি করছ। চল, চল, আরতি করে এসে জল-টল খাব। আচ্ছা খেপীর পাল্লায় পড়া গেল দেখছি!

বলতে বলতে নেমে দাঁড়ালেন মেঝেয়। দিন রাতের সন্ধিক্ষণ সন্ধির সন্ধান দিলে। মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন ইষ্টদেবতাকে—

অনন্তদেব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হক—হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, কিছুই লুকনো নেই তোমার কাছে। অন্তর্যামী, আলো দেখাও। আর যে পারি না অন্ধকারে হাতড়ে মরতে। সন্ধ্যাদীপটি যেন নিভে না যায়।

জ্বলতে লাগল সন্ধ্যাদীপ। স্নিগ্ধ আভায় জুড়িয়ে গেল দিনের জ্বালা। দুঃস্বপ্ন, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখেছেন সারাদিন ত্রিবেদী মশাই। দুঃস্বপ্নে গোবিন্দকে স্মরণ করতে হয়। গোবিন্দ স্মরণ করে তিনি খেতে বসলেন। রাত্রে দুধ আর মিষ্টি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়, সেদিন ভোগ হল লুচি কপির ডালনা ক্ষীর দিয়ে। সারাদিন মুখে জল দেয় নি মুক্তা,—বিকেলে গঙ্গায় স্নান করে এসে ভোগ তৈরী করছে। পরম পরিতুষ্ট হলেন ত্রিবেদী মশাই, মন্দিরে ভোগ নিয়ে যাবার আদেশ করলেন। যখন স্বহস্তে ভোগ রাঁধতেন, তখন মন্দিরে ভোগ দেওয়া হত। স্বহস্তে ভোগ রান্না বন্ধ হল চোখ নষ্ট হবার দরুন, মন্দিরে রান্না-ভোগ নেওয়াও বন্ধ হল। বললেন—একই কথা। অনেক সব নাম করা মন্দিরে রান্না ভোগ নেওয়া হয় না। রান্না-ঘরের লাগাও ভোগ মন্দিরে ভোগ নিবেদন করা হয়। তাতে ভোগের পবিত্রতা বজায় থাকে। দেবতা তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করেন।

সেই থেকে রান্না-ভোগ ত্রিবেদী মশাইয়ের নিজের ঘরেই বেড়ে দেওয়া হয়। জানে কিন্তু সকলেই তাঁর মনের কথা। অপরের রান্না ভোগ একান্ত বাধ্য হয়েই নিবেদন করেন তিনি, ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করে প্রসাদ পান। কিন্তু সাক্ষাৎ অনন্তদেবের সামনে অপরের রান্না ভোগ সাজিয়ে নিবেদন করা—না, অতটা বাড়াবাড়ি ত্রিবেদী মহাশয়ের মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

সেদিন সন্ধ্যার পরে তাও সম্ভব হল। সন্ধ্যাদীপ জ্বলছে তখন তাঁর অন্তরে, অন্ধকার ঘুচে গেছে। অন্তরের আলোয় সবই আলো-ময় দেখছেন তখন। শুচি-শুদ্ধ পবিত্র সবই আনন্দের উৎস বলে মনে হচ্ছে। বললেন—তোমার হাতের রান্না ভোগ অসঙ্কোচে নিবেদন

করব দেবতার দৃষ্টির সামনে স্থাপন করে। নিজের তৈরী বিচারের বেড়া নিজেই ভেঙে ফেলব। শুচি-অশুচি বিচার করার স্পর্ধা ঘুচে যাক,—ঘৃণা লজ্জা ভয় দূর হক অন্তর থেকে। সব মিথ্যা. সব মিথ্যা, সব মিথ্যা।

মিথ্যাকে মন থেকে বিদেয় দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলেন ত্রিবেদী মশাই, তার পর প্রসাদ গ্রহণ করলে মুক্তা! সারাটা দিন উপোস করে আছে বেচারী,—খামকা কষ্ট পেলে। ত্রিবেদী মহাশয়ের পেড়াপীড়িতে তাঁর ঘরে বসেই তাকে খেতে হল। খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে ঘর পরিষ্কার করে বসল সে ত্রিবেদী মহাশয়ের সামনে। ত্রিবেদী মশাই আসনেই বসে আছেন। ঘুম না পেলে উঠবেন না। গল্প হবে এ-সময়টা গল্প করার সময়! এই সময়টুকু নষ্ট না হলেই হল। আগের সন্ধ্যাটা নষ্ট হয়েছে সিনেমার দৌরাত্ম্যে। সে লোকসানটাও পুষিয়ে নেওয়া চাই।

শুরু করে দিলেন ত্রিবেদী মশাই—তার পর? বল এখন শুনি কি দেখে এলে কালকে!

কি আবার দেখব, দেখবার শোনবার কি উপায় ছিল কিছু। বক-বক বক বক—কানের কাছে বক বক করলে কি সিনেমা দেখা হয়! সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন নাকি বিপুলবাবু, ওঁর বকবকানি শোনাবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার কাছেও আসবেন, শুনবেন তখন আপনিও। সে সব কথা ওঁর মুখ থেকেই শোনা ভাল। আমার মুখে সেসব কথা আসবেই না, তা বলব কেমন করে।

বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ল একেবারে মুক্তা। হাসির ঝাপটায় সন্ধ্যাদীপের শিখাটা কাঁপতে লাগল। প্রমাদ গণলেন ত্রিবেদী মশাই, তাঁর বড় সাধের দীপটি বুঝি নিভে যায়!

তাড়াতাড়ি আড়াল দিয়ে বাঁচাতে গেলেন। বেশ একটু ঝাঁঝালো সুরে বললেন—পাগল, ওটা একটা আস্ত পাগল। আশকারা দিতে নেই অমন লোককে। যত সব বাজে মতলব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

আমার কাছে এসেছিল সে, কিছু বলি নি। আগে শুনে নিই সব ব্যাপারটা তোমার কাছে। কতদূর এগিয়েছে জেনে নিই আগে। তার পর দেখাচ্ছি মজাটা। ইতরামি করার জায়গা পেয়েছে নাকি এটা। আকাশের চাঁদ খাবার আবদার করা বার করে দিচ্ছি। আর একবার এলে হয় !

হাসিটা থেমে গেল মুক্তার, ভয় পাওয়া সুরে বলে উঠল—না না, আপনি অমত করবেন না। অনেক দূর এগিয়েছে বেচারা, এখন যদি বিয়েটা না হয়, খুব খারাপ হবে।

খারাপ হবে ! রুখে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই—খারাপ কি হবে শুনি ? খারাপের মধ্যে এইটুকুই হবে যে একটা ভদ্রঘরের বিধবার সর্বনাশটা হবে না। মনে করেছ বুঝি, বিয়ে হলেই ওর স্বভাব বদলাবে ? ঐ জাতের চরিত্র কখনও বদলায় ? যে একটা বিধবাকে ফুসলতে পারে, সে আরও পাঁচটাকেও পারবে। বিশ্বাস করতে আছে ও রকম জীবকে ! সারাটা জীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে—এই আমি তোমায় বলে রাখলুম।

অনেকটা সময় চুপ করে রইল মুক্তা, ত্রিবেদী মশাই ভাবলেন ওষুধ ধরেছে। ভয় আর সন্দেহ, এই দুটিই এক মাত্র ওষুধ। খুবই বিষাক্ত ওষুধ, কোনও রকমে ওষুধটা গেলাতে পারলেই হল। ওষুধের ক্রিয়া শুরু হলেই মনটা অসাড় হয়ে পড়বে। দেখা যাবে তখন, বিপুল বাবাজী কত বড় ঘড়েল।

গলা খাটো করে খুবই অন্তরঙ্গ ভাবে আবার শুরু করে দিলেন তিনি—জানলে মুক্তা, ঐ বিপুলের মত ছ্যাঁচড়া আমি অনেক দেখেছি। বিয়ে করে না, ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকে। সুযোগ পেলেই আর কথা নেই। সধবা বিধবা কুমারী একটা কিছু পেলেই হল, অমনি তার মাথাটি চর্বণ করে বসেছে। আর হতভাগী মেয়েগুলোও তেমনি হাঁদা, ঠিক ফাঁদে পড়বে। ব্যস—তার পর একেবারে সুকতলার মত মনে করবে। যা খুশি করবে তার নাকের ডগায়। বিয়ে করেছি

যখন তখন মুখ বুজে থাকতে বাধ্য। না থাকতে পার দূর হও, সর্বনাশ তো তোমার করেই ছেড়েছি, এবার গোল্লায় যাও। বল তখন সে হতভাগীর উপায় কি ? হয় মুখ বুজে সারাটা জীবন জ্বলে মরতে হবে, নয় তো গলায় দড়ি দিতে হবে। যখনই কেউ কানের ভেতর মধু ঢালতে আসে, তখনই লাথি মারতে হয় মুখে। তখনই বোঝা উচিত, লোকটার স্বভাব কেমন। এক জনকে ফুসলাচ্ছে, তখন আর এক জনকে আবার ফুসলাবে না, তার ঠিক কি। ওই রকম লোকের ছায়া মাড়াতে আছে !

মিনমিনে গলায় মুক্তা বলল—সকলেই কি এক রকম হয় ! বিপুল-বাবুকে তো আপনি ভাল করে চেনেন। তার মত মানুষ—

ঘুঘু—একটি আসল ঘুঘু। ত্রিবেদী মশাই আরও গলা খাটো করলেন। খুবই একটা গোপনীয় কথা বলছেন যেন. ভেতরের কথাটা ফাঁস করতে যেন তাঁর বিবেকে বাধছে। কিন্তু না বলেও যে উপায় নেই, তাই বললেন—সব সংবাদ তো আর সবাই জানতে পারে না। কিন্তু আমি তো জানি। আগের বার ঠিক এই ভাবে কেঁদে পড়ল এসে আমার কাছে। সেবার সর্বনাশটা অনেক দূর গড়িয়েছিল। চেপে ধরলাম আমি—কর বিয়ে, নয় তো কিছুতেই ছাড়ব না। করলে কি জান ! এমন এক চাল চাললে যে মেয়েটাও ঠকল, আমিও ঠকলাম। খদ্দের জুটিয়ে ফেললে। পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা তখন মেয়েটা, সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে গেল পঞ্জাবে। সেখানে আর্যসমাজী মতে বিয়ে করবে বলে নিয়ে গেল। ফিরে এল কিছু টাকা নিয়ে। কর তখন কি করবে।

এই একান্ত অবিশ্বাস্য গল্পটা শুনে মুক্তা জিজ্ঞাসা করলে,—এখানে কেউ গোলমাল করলে না ? কোথায় গেল মেয়েটা জানতে চাইলে না ওঁর কাছে ?

ত্রিবেদী মশাই বললেন—খেপেছ ! কার দায় পড়েছে তার জন্যে মাথা ঘামাবার। যাদের ঘাড়ে চেপে বসে ছিল সে, তারা স্বস্তির

নিশ্বাস ফেললে।

মুক্তা চুপ, ত্রিবেদী মশাই কান পেতে রইলেন। মনে মনে সাবাস দিলেন নিজেকে, মোক্ষম দাওয়াই, দাওয়াইটা ঠিক ধরেছে। ভাবুক, ভাবতে থাকুক। ভেবে দেখুক এখন কি করবে।

অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রা-ভাঙা সুরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে মুক্তা—ঘুম পাচ্ছে বড়। মাথার যন্ত্রণায় সারাটা রাত ছটফট করে মরেছি—

ত্রিবেদী মশাই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—ঠিকই তো। একে ঘুমতে পার নি রাত্রে, তার পর সারাদিন উপোস গেল। যাও, শুয়ে পড় গে। ঘুমোলে মাথা ঠাণ্ডা হবে। তখন বুঝতে পারবে, ও রকম মানুষকে বিশ্বাস করা কত বড় বিপদের কাজ। ওই সব ঘুঘুদের কি বিশ্বাস করতে আছে।

বিছানায় উঠে পড়লেন তিনি, মশারি ফেলে দিয়ে চলে গেল মুক্তা। ঘর অন্ধকার হল।

সন্ধ্যাদীপটি কি নিভে গেল!

ত্রিবেদী মশাই ভয়ে ভয়ে তাকালেন তাঁর মনের ফুটোয় চোখ দিয়ে, দেখে আশ্বস্ত হলেন। না, নেভে নি, জ্বলছে ঠিক জ্বলছে। খুব মিষ্টি একটু আলো ছড়াচ্ছে তাঁর বুকের মধ্যে, তাতে সেখানকার নিবিড় আঁধারটা বেশ ফিকে হয়ে উঠেছে।

মিষ্টি আলোটুকুর পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁরও তন্দ্রা এসে গেল। অদ্ভুত একটা অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলেন। খুব নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরেছে যেন কে, একেবারে মিশে গেছে তাঁর শরীরের সঙ্গে। ক্রমেই অবশ হয়ে পড়ছে তাঁর শরীরটা, আবেশে এলিয়ে পড়ছে। নেশার মত, ঠিক নেশার মত। এই রকম নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মানুষে কেয়া ঝাড়ের কাছে পৌঁছলে। শ্রাবণ মাসে আকাশ যখন নেমে আসে মাটির মুখে চুমু দিতে, কেয়ারা তখন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে মাথা দোলায়। দেহটা লুকোলে হবে

কি, গন্ধটা যে লুকোতে পারে না। গন্ধটা যে পালাবে কোথাও সে উপায়ও নেই। আকাশে মাটিতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে তখন, ফাঁক কোথায়। এমনি সময় যদি কেউ পৌঁছতে পারে কেয়া ঝাড়ের কাছে, তা হলে তার নেশা লাগবেই। কেয়ার গন্ধ মিশে যাবে শরীরের রক্তের সঙ্গে, নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলেন ত্রিবেদী মশাই. নেশার ঘোরে মনটা তাঁর কেয়া ঝাড়ের ধারে ঘুরঘুর করতে লাগল।

দেবতা জেগে রইলেন, দেবতার চোখে তন্দ্রা নামে না। তন্দ্রাহীন নেত্রে তাকিয়ে রইলেন ভোগের দিকে। ক্ষুধা তাঁর মিটল না। বলি চাই, আরও বলি চাই। বিচার বলি দিয়ে সেই রক্ত ছিটিয়ে ভোগ শোধন করে মন্দিরের মধ্যে নিবেদন করে এলেন ত্রিবেদী মশাই, দেবতা শুধু তাকিয়েই রইলেন। মনঃপুত হল না তাঁর। বলি চাই, আরও বলি চাই।

সন্ধ্যাদীপটি জ্বলছে কি এখনও। ঐ যাঃ—কখন নিভে গেছে।

এখন কি হবে।

অন্ধকার।

উঃ কি অন্ধকার।

ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন ত্রিবেদী মশাই, আকাশ দেখতে পেলেন না। অতবড় আকাশখানা অতগুলো নক্ষত্র সুদ্ধ বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। আকাশের পেছনে লুকনো অন্ধকারের সমুদ্রটা ভেঙে পড়ছে ধরিত্রীর বুকে। অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে সাঁতরাতে লাগলেন তিনি। ওপরে অন্ধকার, নীচে অন্ধকার, সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু অন্ধকার। আলকাতরার মত কালো আলকাতরার মত চটচটে অন্ধকার। কার সাধ্য সেই গাঢ় চটচটে গলানো আলকাতরায়

সাঁতার দিয়ে এগোবে!

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে সময় ত্রিবেদী মশায়ের বুকে চুল গজায় নি, ঠোঁটের ওপর সবেমাত্র কালো রেখার ছোঁয়াচ লেগেছে। সে সময়ের বুক কাঁপবার বুক নয়। তবু কেঁপে উঠল। উঠলেও তিনি ফিরলেন না, ফেরবার বয়স নয় সেটা, এগিয়ে চলার বয়স, এগিয়েই চললেন।

এগিয়ে যাচ্ছেন নিজের শক্তিতে, না তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। থেমে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসবার জন্যে অনেক বার চেষ্টা করলেন। উপায় নেই, আলকাতরার সমুদ্রে স্রোতের টান ঠেলে উজানে উঠে আসা—পিশাচের পক্ষেও সম্ভব নয়। পিশাচ নামতেও সাহস করবে না আলকাতরা-সমুদ্রে, ত্রিবেদী মশাই করেছিলেন। করেছিলেন, কারণ তিনি পিশাচ নন। পিশাচের পৈশাচিক পিপাসা মানুষের পিপাসার কাছে অতি তুচ্ছ। পিপাসা নিবৃত্তি না হলে পিশাচ মরে না, মানুষ মরে। হাঁ, পিপাসায় বুকখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল বলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই সেই আলকাতরা-সমুদ্রে। তার পর স্রোতের টানে পৌঁছেওছিলেন ঠিক জায়গায়। কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হয় নি।

জল নেই, জলের বদলে চাপ চাপ থকথকে রক্ত। বিষাক্ত রক্ত, শমন সদৃশ বিষাক্ত বীজ সেই রক্তের মধ্যে কিলবিল করছে।

ভরদ্বাজের বউই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

ঠিক জায়গায় পৌঁছে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, আগে সেই ফুটোটায় চোখ দিয়ে দেখে নিলে হয়। মাঝখানে অনেকগুলো দিন চলে গেছে, কে জানে কি খেয়ে কাটিয়েছে। নিশ্চয়ই কাছিম ধরেছে। প্রথম দিন সেই ফুটোয় চোখ দিয়ে যে দৃশ্য দেখেছিলেন তিনি, সেইটে ফুটে উঠল চোখের সামনে। মোচড় দিয়ে উঠল বুকখানার মধ্যে। হয়তো আজও তাই করছে, একলা ঘরখানার মধ্যে বসে চিবচ্ছে কাছিমের মাংস, আর

তাকিয়ে আছে আগুনটার পানে। কেউ নেই, কেউ নেই ওর। উঃ, কি ভয়ানক একলা! ঐটুকু প্রাণটা একলা বেঁচে আছে ওর ক্ষুধা নিয়ে, এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাতে একলা ঐ ঘরে বসে কাঁচা কাছিম খুবলে খাচ্ছে। আর সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

স্থির থাকতে পারলেন না ত্রিবেদী মশাই। আগে সেই ফুটো দিয়ে দেখে নিতে হবে, কি করছে। তার পর ডাকতে হবে। ডেকে বুঝিয়ে বলতে হবে যা বলতে এসেছেন। সোজা কথায় বলবেন হয় তুমি পালিয়ে চল আমার সঙ্গে, নয় তো আমি মরব। যে ভাবে হোক শেষ করে দোব নিজেকে, কারণ জীবন নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তুমি এই ভাবে একলা এখানে পড়ে শুকিয়ে মরছ, এটা আমার পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। তুমি মানা করেছিলে, এত দিন আসি নি। কিন্তু আর পারলাম না। বুঝে দেখ, কি ভাবে কেটেছে আমার দিন-রাতগুলো, কি জ্বালায় জ্বলছি আমি। কি করে বাঁচব এ ভাবে? হয় তুমি রাজী হও, নয় তো আমি মরি। মরে তোমার হাত থেকে রেহাই পাই।

কথাগুলো আর এক বার মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে ফুটোর কাছে পৌঁছলেন। তার পর চোখও দিয়েছিলেন ফুটোতে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাতা জ্বলন্ত অঙ্গার যেন পড়ল এসে তাঁর চোখে। ছিটকে পড়লেন পেছনের বেত ঝোপে। চোখের জ্বালায় তখন প্রাণ যায়।

আর সেই ফুটোয় চোখ দেন নি।

চোখের আগুন তখন মনের গায়ে লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে বারুদ, বারুদগুলো আবার দরদে ভেজানো। দরদে ভেজানো মনের বারুদ প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ। আগুনের ছোঁয়া পেলে আর রক্ষে নেই, সব উড়িয়ে দেয়। দয়া মায়া মমতা প্রেম, এই সমস্ত মিষ্টি মিষ্টি নামের লেবেল আঁটা যে সমস্ত মহামূল্য মদের বোতল জমা থাকে হৃদয়-ভাণ্ডারে, নিমেষের মধ্যে সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়। বোতলগুলোর মধ্যে আসল পদার্থ যেটা থাকে, সেটায় তখন আগুন লাগে। অতি তীব্র

সুরাসার, কামনার বিষ চোলাই হয়ে সেই সুরাসারের উৎপত্তি। মিষ্টি মিষ্টি নামের লেবেল আঁটা বোতলে পুরে হৃদয়-ভাণ্ডারে লুকিয়ে রাখা হয় সে জিনিস। তাতে আগুন লাগলে আর রক্ষে নেই। হৃদয়-খানাকেই ছাই করে ফেলে তবে ছাড়ে।

সব পুড়ে গেল, ত্রিবেদী মশায়ের মনের ভাণ্ডারে জমা করা যা কিছু সম্পদ সব ছাই হয়ে গেল। কেন তিনি এলেন। এতগুলো রাত তুষানলে দগ্ধ হয়েছেন কার জন্যে। একটা নরকের কীটের জন্যে তিনি মুখে অন্ন তুলতে পারেন নি, শুয়ে চোখ বুজতে পারেন নি। ইস্-কি অধঃপতন! ত্রিবেদী, বাড়ির ছেলে, গ্রাম সুদ্ধ মানুষ যার পায়ের ধুলো নেয়, সে কোথায় নেমে দাঁড়িয়েছে!

দাঁড়িয়েছে যখন নেমে, তখন একটা এসপার ওসপার না করে আর উঠছে না। নরকের কীটটাকে অন্ততঃ এক বার জিজ্ঞাসা করে যেতে হবে, কেন সে এ কাজ করছে।

পোড়া পেট কি তার ভরত না? পোড়া পেটের জন্যে ত্রিবেদী বাড়ির ছেলেই তো সব জোটাতে চেয়েছিল। তবে?

জবাবটা কি দেয়, না শুনে কিছুতেই ফেরা হবে না। নরকের কীট কি জবাব দেয় শোনা চাই।

জবাব শুনেই ফিরেছিলেন ত্রিবেদী মশাই। জিজ্ঞাসা করতে হয় নি, নরকের কীট সেধে সব বলেছিল।

ওঠ গো ঠাকুর, ঘরে চল। এই বেতের ঝোপে বসে সাপের বিষে মরবে নাকি?

নিদারুণ চমকে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। মুখ তুলে দেখলেন, অন্ধকারের মধ্যে দুটো চোখ জ্বলছে। কতক্ষণ যে বেহুঁশ হয়ে বসে-ছিলেন, খেয়াল করতে পারলেন না। চেষ্টা করে খাড়া করলেন শরীরটাকে, তার পর তার পিছু পিছু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন! সেই ঘর, যার প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর মুখস্থ, অথচ কখনও পা দেন নি যে ঘরে,

সেই ঘরে সশরীরে আবির্ভূত হলেন।

ভরদ্বাজের বউ বলল—কোথায় বসাই! এক কাজ কর, ঐ মাচাটার ওপর একখানা পিঁড়ি আছে, নামিয়ে নিয়ে বসো। পিঁড়িখানা নষ্ট হয় নি, আমি ছুঁলেই নষ্ট হবে। নাও, পেড়ে নাও।

ত্রিবেদী মশাই একটুও নড়লেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ছুঁলে পিঁড়িখানাও নষ্ট হবে! কাঠের পিঁড়ি নষ্ট হবে! মানে?

ভরদ্বাজের বউ খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে কখনও দেখেন নি তাকে ত্রিবেদী মশাই, অমন চমৎকার হাসি হাসতে পারে জানতেন না। খুবই চমৎকৃত হলেন। চমৎকৃত হলেন আরও ওর সাজপোশাক দেখে। কি আশ্চর্য মানিয়েছে! কচি কলা পাতা রঙের কাপড়, কলাপাতা রঙের কাঁচের চুড়ি, টেমির আলোয় ভাল করে বোঝা গেল না আরও কি কি আছে। যেটুকু বোঝা গেল, তাই যথেষ্ট। আশ্চর্য তো!

দুখানা লালপেড়ে শাড়ি, যজমান বাড়ি থেকে পাওয়া, যেমন মোটা তেমনি খাটো, বাড়ি থেকে চুরি করে এনে দিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই। জানতেন কি তখন কচি কলাপাতার রঙটা এমন চমৎকার মানায় ওকে। জানলে নিশ্চয়ই কিনে এনে দিতেন শহরে গিয়ে। সেই চক্ষুশূল গুণচট পরে থাকতে হত না। বললে তো জানবেন। একটিবার মুখ ফুটে বললেই পারত। তা বলবে কেন, এখন বলবার লোককে বললে। উঃ—কি নেমকহারাম!

ভরদ্বাজের বউ বলল—মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে কি অত ভাবছ ঠাকুর? যাক্, তুমি এলে আমি ছুটি পেলাম। জানতাম, এক দিন এক বার তুমি আসবেই। তাই রোজ রাতে ঐ জায়গাটা দু-তিন বার ঘুরে আসি। আজ তোমায় কুড়িয়ে পেলাম, মা মনসা মুখ তুলে চাইলেন।

ত্রিবেদী মশাই জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না—কেন? কি দরকার আমার সঙ্গে?

ঐ শোন কথা! ভরদ্বাজের বউ গালে হাত দিলে। বিচিত্র ভঙ্গিমা

করে বিচিত্র সুরে বলে উঠল—যাবার সময় একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব না, এ কি একটা কথা হল।

যাচ্ছ! ঢোঁক গেলবার চেষ্টা করে পারলেন না ত্রিবেদী মশাই, আর কিছু বলতেও পারলেন না—। গলা জিভ মুখের ভেতরটা শুখিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।

ভরদ্বাজের বউ খুবই আমোদ পেল যেন। বিশ্রী রকম সুর করে বলে উঠল—ও মা! যাব না তো কি চিরকাল পচে মরব নাকি এখানে! ছিরি দেখ কথার!

ঢংটা বরদাস্ত করতে পারলেন না ত্রিবেদী মশাই, মুখ নুইয়ে ফেললেন। কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে। হাতে পেয়ে ছাড়বে কেন ভরদ্বাজের বউ। নামতে নামতে কোন্ রসাতলে তলিয়ে গেছে সে, সে পরিচয় ষোল আনা না দিয়ে কেন ছাড়বে! অপূর্ব ছিরি-সম্পন্ন করে তুলল সে মুখ-চোখের ভাবটা, দুর্গন্ধ গাঁজলা খানিকটা গড়িয়ে পড়ল যেন রসের হাঁড়ি উপচে। হাত দুখানি ত্রিবেদী মশায়ের মুখের কাছে তুলে নাড়তে নাড়তে বললে—

হ্যাঁ গো ঠাকুর ভারী মন খারাপ হয়ে গেল—না—? হবেই তো, তখন আর ফুটোয় চোখ দিয়ে দেখবে কি। চল না, চল আমার সঙ্গে। ঘরের ভেতরেই এমন ভাবে লুকিয়ে রাখব তোমায় যে কেউ টের পাবে না। তোমারও খুব আরাম হবে। বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আর পা ব্যথা হবে না। কেমন—?

আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তখন ত্রিবেদী মশাই গলায় স্বর ফোটাবার জন্যে। স্বর ফুটবে কি, গলায় তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসছে। তেতো, উৎকট তেতো রক্ত গলা ছাড়িয়ে মুখের মধ্যেও এসে গেছে, ওগরাতে পারলে রক্ষা পান।

সে উপায় নেই। ভরদ্বাজের বউ তার সবটুকু বিষ উগরে উজাড় করে না দিয়ে কিছুতে রেহাই দেবে না। লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলতে লাগল—

কি করব বল। এখানে সব তোমার মত সাধুপুরুষরা বাস করেন। আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে পারলেই খিদে মিটে যায়। আমারও তো সাধ-আহ্লাদ আছে। আমি তো আর কারও শোবার ঘরে উঁকি দিতে পারি না। তাই যাচ্ছি। না গিয়ে উপায় কি বল। এখানকার সাধুপুরুষদের চোখের খিদে মেটাতে গেলেও যে একটা পুরুষ মানুষ দরকার। পুরুষ মানুষ পাই কোথায় এখানে। বাইরে থেকে পুরুষ আমদানি করে তোমাদের সন্তুষ্ট করা কি সহজ কথা। তাই তো বলছি, চল না আমার সঙ্গে। চল, তোমায় আমি ঘরেই লুকিয়ে রাখব কোনও কষ্ট হবে না। তোমায় আমি—

হুঁশ হারিয়ে ফেললেন ত্রিবেদী মশাই, কি করছেন টের পাবার আগেই একখানা হাত তাঁর ছিটকে উঠল ওপর দিকে। চটাং করে একটা আওয়াজ হল। নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল কাণ্ডটা, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভরদ্বাজের বউ, বাঁ হাতখানা বাঁ গালের ওপর চেপে ধরে—মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সুর থেমে গেছে, ঘর এমন নিস্তব্ধ যে ছুঁচ পড়লেও টের পাওয়া যায়।

ছুঁয়ে ফেললে!

ফিসফিস করে কে যে উচ্চারণ করলে কথাটা, ঠিক ধরতে পারলেন না ত্রিবেদী মশাই। নিদারুণ আতঙ্কে—ফিসফিসানিটুকু থর-থর করে কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবেদী মশায়ের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভয়ানক রকম শিউরে উঠল। আর একবার সেই অতি মারাত্মক কথাটা ঢুকল তাঁর কানে—ছুঁয়ে ফেললে! সামনে তখনও ঠিক সেই ভাবে মুখ নুইয়ে বাঁ হাতখানা বাঁ গালের ওপর চেপে দাঁড়িয়ে আছে ভরদ্বাজের বউ, জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে না। ত্রিবেদী মশাইও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দম ফাটবার উপক্রম হয়েছে তাঁর, ঘরের বাতাস তেতে আগুন হয়ে উঠেছে।

পুড়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা, তেষ্টায় ছাতিটা ফেটে চৌচির হয়ে যায় বুঝি!

হঠাৎ এক ঝটকায় মুখ তুলল ভরদ্বাজের বউ, চোখ দুটিতে সে কি বীভৎস চাউনি! রাগ নয় দুঃখ নয়, শুধু ভয়। চরম সর্বনাশ হাঁ করে গিলতে এলে ঐ জাতের আতঙ্ক বোধ হয় জমা হয় চাউনিতে। সেই চাউনিটা তখন ফিসফিসিয়ে উঠল। ত্রিবেদী মশাই সেই চাউনির দিকে তাকিয়ে রইলেন আর শুনতে লাগলেন—কি সর্বনাশ করলে! কেন ছুঁলে আমায়! কেন ছুঁলে! তোমার কিছু হয় যদি! যদি তোমাকেও ধরে ফেলে!

আর পারলেন না ত্রিবেদী মশাই, দু হাত তুলে টপ করে চেপে ধরলেন মুখখানি। দু পাশের দুই কান দুই গলা তাঁর হাতের মধ্যে এসে গেল। চোখ দুটির সেই ভয়াল চাহনি তখনও স্থির চেয়ে আছে তাঁর মুখের ওপর। ওপর দিকে তোলা মুখখানির খুব কাছাকাছি নামিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের মুখ। সেই ভয়ঙ্কর চাউনির তলায় সেই অন্ধকারের মধ্যে কি যে খুঁজতে লাগলেন, তিনিই জানেন। ঐ সামান্য দুটি কথা তাঁর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল—

ভয় নেই, ভয় নেই।

স্থির হয়ে রইল দুটি প্রাণী সেই ভাবে। দু জনে দু জনের চোখের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল। আলকাতরার মত কালো অন্ধকারে তলিয়ে রইল সেই ছোট্ট টিনের ঘরখানি। বাকী দুনিয়াটার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

গুম্ গুম্ গুম্ গুম্—অনেক দূর থেকে ভেসে এল ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, ক্রোশের পর ক্রোশ তলিয়ে যাচ্ছে বিষখালী নদীর গর্ভে। পাড় ভাঙছে, নদী এগিয়ে আসছে, ভয়ঙ্করী বিষখালীর জোয়ার ভাঁটার টানে এ কূল ও কূল ধ্বংস হয়ে গেল। বিষখালীর গ্রাস থেকে কিছুই বাঁচবে না।

আচমকা একটা ধাক্কা লাগল ত্রিবেদী মশায়ের বুকে, হাত দুয়েক পিছনে ছিটকে পড়লেন তিনি। ধাক্কা সামলে দেখলেন, ভরদ্বাজের বউ ঘরের কোণে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে, ঝুঁকে পড়েছে উনুনের ওপর। মুহূর্ত-মধ্যে সে ঘুরে দাঁড়াল একখানা জ্বলন্ত চেলা হাতে নিয়ে। গনগনে আগুনটা সামনে বাড়িয়ে ধরে চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, —সাবধান।

ত্রিবেদী মশাই এক চুল নড়লেন না, বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—মারবে? মার—। তবু তোমায় ছেড়ে যাব না। কিছুতেই তোমায় ফেলে যাব না।

অনেকটা সময় স্থির হয়ে রইল ভরদ্বাজের বউ। তার পর অতি ভয়ঙ্কর সুরে দাঁতে দাঁতে ঘষে বললে—কেন? কেন? কি করবে আমায় নিয়ে গিয়ে?

এইবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। বললেন—জানি না। কিছুই করব না, এক সঙ্গে মরব শুধু—

ভরদ্বাজের বউ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ত্রিবেদী মশায়ের পানে। তার পর হাতের আগুনটার দিকে তাকিয়ে খুব চুপি চুপি নিজেকেই যেন বলতে লাগল—আর হয় না, আর সময় নেই। বড্ড দেরি হয়ে গেল। এতদিন পরে সময় হল তোমার? কাঁচা কাছিম খেতে দেখে-ছিলে যেদিন, সেদিন শুধু চাল-ডালের কথা মনে হয়েছিল। তার পর সেই চাল-ডালের বদলে যা পেয়ে সন্তুষ্ট হলে, তা মনে হলেও গা ঘিন-ঘিন করে। আজ নিতে এসেছ। কি নেবে? জান কি করেছি? গঞ্জের ঘাটে বেদেদের নৌকো লেগে আছে, জান তো। সেই নৌকোর একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব করে ওষুধ নিয়েছি। সে ওষুধ মিশে গেছে রক্তের সঙ্গে, ফল ফলতে শুরু করেছে। তার পর কি করেছি শুনবে? কে আমার ঘরে ছিল জান? কার মাথাটা চিবুলাম শুনবে? রাখেশ চাটুয্যের একমাত্র বংশধর নীলমণিকে চেন তো? সেই নীলমণি ছিল ঘরে, শেষ করে দিয়েছি। নীলমণি নীল হয়ে যাবে, রাখেশ চাটুয্যের

চোখও নীল হয়ে যাবে। ভরদ্বাজকে খেয়েছে রাখেশ চাটুয্যে,—আমি তার এক মাত্র ছেলের মাথাটা চিবিয়ে খেলাম।—এত দিনে আমার খাওয়া শেষ হল।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন ত্রিবেদী মশাই, ভরদ্বাজের বউ থামতেই বলে উঠলেন—কেন? কি করেছিল তোমার রাখেশ? অতটুকু ছেলে নীলমণি, কি করলে তার? কি ভাবে তাকে হাতে পেলে?

কি করেছে রাখেশ চাটুয্যে আমার? ভরদ্বাজের বউ খুবই শান্ত ভাবে বলতে লাগল—আমার কি করবে সে? দেশের লোক জানে, রাখেশ চাটুয্যে বড়লোক। দান ধ্যান করে, বড় দয়ার শরীর রাখেশ চাটুয্যের। দান করার টাকা কোথা থেকে আসে, সে খবর কেউ রাখে না। দান করতে গেলে টাকা চাই, টাকা জোটাতে গেলে দল বানাতে হয়, দল রাখতে গেলে নিয়ম বেঁধে দিতে হয়। ভারী চমৎকার নিয়ম রাখেশ চাটুয্যে বানিয়েছে। দলের লোক যদি ধরা পড়ে বা দলের কারও নামে যদি হুলিয়া বেরোয়, তবে তাকে শেষ করে দাও। ধরা পড়বার পরে মুখ না খুলতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। আমি আরও ভাল ব্যবস্থা করলাম। আগুন জ্বেলে দিলাম রাখেশ চাটুয্যের বুকে। ঐ ছেলে ওর নয়নের নীলমণি, নীলমণি এই বয়সেই তৈরী হয়ে উঠেছিল। কিশোরী যুগীর ঘরে বসে তামাক টানত, আর ওর মেয়েটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাত। দু দিন যাওয়া আসা করলাম সেখানে, তিন দিনের দিন ঠিক আসছে পিছু পিছু। সোজা পথ ছেড়ে দক্ষিণের খাল পার হয়ে হোগলা বনের ভেতর ঢুকে লুকিয়ে পড়লাম। ঠিক পৌঁছল সেখানে, পৌঁছে কাউকে না দেখতে পেয়ে চকা এঁড়ের মত চারিদিকে তাকাতে লাগল। তখন হাত ধরা আর নিয়ে আসা। রাক্ষস বাপের রাক্ষুসে ছেলে। রোজ আসছে, একটি দিন কামাই নেই। আসছে আর বিষ নিয়ে যাচ্ছে আমার শরীর থেকে। ফল ফলছে, আজ এসে দেখালে মুখের ওপর চাকা চাকা দাগ, ফুলেও উঠেছে। আর ভাবনা নেই, আর আসতে পারবে না।

কালই সর্বাঙ্গে ফুটে বেরবে। নীল হয়ে যাবে নীলমণি, রাখেশ চাটুয্যে দেখবে আর তার বুকখানা শীতল হবে।

ত্রিবেদী মশাই অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠলেন—মিথ্যে কথা। একদম বিশ্বাস করি না। মিছিমিছি আমায় ভয় দেখাচ্ছ।

ভরদ্বাজের বউ বললে—মিথ্যে কথা! দেখবে তা হলে? দেখতে চাও? বেদেদের ওষুধ মিথ্যে কি সত্যি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ওষুধটা শরীরের রক্তে মিশলে কি না, তা জানবার উপায় আছে। এই ওষুধের গুণ এমন যে আগুন খাওয়া যায়। আগুন খেলেও কিচ্ছু হয় না। আচ্ছা, তোমায় না হয় দেখিয়ে দিচ্ছি—

বলতে বলতে হাঁ করলে ভরদ্বাজের বউ, জ্বলন্ত কাঠখানা দিলে পুরে মুখে। আঙারটা কামড়ে ভেঙে নিয়ে-কড়মড় করে চিবোতে লাগল।

আঁ—আঁ—আঁ—

ঘুমের ঘোরে বিকট রকম চেঁচিয়ে উঠলেন ত্রিবেদী মশাই। ঘুম ভেঙে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। শ্বাস ফেলবার চেষ্টা করলেন, মশারির মধ্যে হাওয়া নেই। আর থাকতে পারলেন না। বিছানা থেকে নেমে বেরিয়ে এলেন ঘর ছেড়ে। দালানে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বুঝতে পারলেন, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, হাঁ করে ঠাণ্ডা হাওয়া গিলতে লাগলেন। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে, ঘরের ভেতর খাটের পাশে জলের ঘটি রয়েছে। কিন্তু কে যায় ঘরের ভেতর আর! উঃ—

তখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ত্রিবেদী মশাই, প্রত্যক্ষ দেখছেন—তাঁর ঘরেই ঠিক তাঁর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভরদ্বাজের বউ। ডান হাতে রয়েছে একখানা চেলা কাঠ, কাঠের মাথার জ্বলন্ত আঙারটা নেই। চোখ বুজে কড়মড় করে চিবুচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন তার

সর্বশেষ কথাগুলো—আগুনখাকী আমি। জন্মেই মা খেয়েছি বাপ খেয়েছি। যারা বাঁচালে, বার বছরের করে তুললে তাদের খেলাম। তার পর গেলাম যার কাছে, সে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলে। স্বামীর বাড়ি এসে দেখলাম, খাবার কিছু নেই। স্বামী নিজে খাই খাই করে ঘুরে বেড়ায়। তার পর স্বামীর মাথাও খাওয়া হল। শেষ খাওয়া রাখেশ চাটুয্যের মাথাটা, সে আশাও মিটেছে। পালাও, পালাও বলছি শীগ্‌গির, পালাও সামনে থেকে। নয় তো তোমায় খাব। দেখবে? মজা দেখবে?

দরকার নেই আর মজা দেখে, যথেষ্ট হয়েছে। দরজার সামনে থেকে খানিকটা সরে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। ঘরের ভেতর থেকে আগুনের হল্কা বেরচ্ছে। কার সাধ্য দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে!

বেরবেই।

রাশীকৃত কাঠ, শুকনো—ঝনঝনে শুকনো বেল আর চন্দন, তার পর ঐ ঘি ধুনো গুগ্‌গুল কর্পূর—সাংঘাতিক রকমের দাহ্য পদার্থ সবগুলো। জ্বলবেই—সময় পেলে ঠিকই জ্বলে উঠবে।

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায় যে এধারে। আগুন খেলে কি তেষ্টা মেটে!

জল কোথায়!

কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেলেন ত্রিবেদী মশাই, তখন তাঁর খেয়াল হল। পাশেই মুক্তার ঘরের দরজা, পাশের ঘরেই শোয় মুক্তা। কখনও যদি তাঁর কিছু দরকার পড়ে রাত্রে, ডাকতে পারবেন। এতদিন একবারও দরকার পড়ে নি, ডাকেন নি কখনও। আজ ডাকা উচিত। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু ডাকবেন না! কেন ডাকবেন না! সময় মত ডাক দিতে কেন পারবেন না তিনি! ডাকবার সময়টা পার হয়ে গেলে ডেকে কি হবে!

আর হয় না—আর সময় নেই—এতদিন পরে সময় হল তোমার?

আগুনখাকী আগুন খাবার আগে ডুকরে উঠেছিল। সময় পার করে দিয়ে পৌঁছেছিলেন তিনি তার সামনে। সময়ের সংকেত ধরতে পারেন নি।

এবার সময়টাকে কিছুতেই পালাতে দেবেন না। বিপুল কাল আসবে। বিপুল—একটা নচ্ছার হ্যাংলা মিটমিটে শয়তান, সিনেমা দেখবার নাম করে নিয়ে গিয়ে কানের কাছে বক বক করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে। উঃ—কত বড় সাহস। চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর বাড়িতে, চতুর্ভুজ ত্রিবেদী বেঁচে রয়েছেন সশরীরে। চতুর্ভুজ ত্রিবেদী থাকেন ওপর তলায় আর নীচের তলায় চলে নচ্ছারপনা। চোখ গেছে যে চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর কাজেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে কেড়ে নিচ্ছে অন্ধের একমাত্র সম্বল। অন্ধকে ফাঁকি দেওয়া, অন্ধকে কানা করে দেওয়া মোটেই শক্ত কাজ নয়। অন্ধের কি কানাকড়ি মূল্য আছে!

আছে কি নেই, দেখাচ্ছি। ভয় আর সন্দেহ, দুটো বিষ ঢেলে দিয়েছি কানে। ঐ বিষের ক্রিয়া থাকতে থাকতেই ডাক দেওয়া চাই। নয় তো শুনতে হবে—আর হয় না—আর সময় নেই—এত দিন পরে সময় হল তোমার?

সময় হয়তো পার হয়েই গেছে। সেবার টিনের ফুটোয় চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে সময়টাকে পালাতে দিয়েছিলেন, এবার দিলেন গল্প শুনে। বিপুল ওত্ পেতেছিল। ওধারে তিনি পরম নিশ্চিন্তে গল্প শুনছেন, এধারে বিপুল সময়ের সদ্ব্যবহার করেছে। হাঁ—অন্ধ। সত্যিই তিনি অন্ধ। চোখ থাকতে অন্ধ, চোখ খুইয়েও অন্ধ। জীবন ভোর অন্ধ থেকে গেলেন আর ঠকলেন। কিন্তু আর নয়। আর কোনও মতেই ঠকলে চলবে না। বাঁচতে হবে তো, বেঁচে যে থাকতেই হবে। এবারও যদি সময়টা ফসকে যায়, তা হলে বাঁচবেন কেমন করে। অন্ধ তিনি, চোখের গর্তে কিছুই নেই। কার চোখ দিয়ে দেখবেন। কার মন দিয়ে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন!

এখনও হয়তো সময় আছে, সময়টাকে কিছুতেই পালিয়ে যেতে দেবেন না। কিছুতেই না।

মুক্তার কপাটের ওপর হাত রাখলেন ত্রিবেদী মশাই, ঠিক জায়গায় ঠিক সময় পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত। যাক্—আবার দম নিতে হচ্ছে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে কি না গলা বুক সব। জল চাই, তেষ্টার জল। নিজের ঘরে জল নেই, আছে আগুন। রাশীকৃত শুকনো কাঠের গর্ভে লুকিয়ে রয়েছে দাবাগ্নি। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আগুনখাকী। পাশের ঘরেই জল। দরজায় ঘা দিলেই হয়।

মুহূর্ত কয়েক দাঁড়ালেন ত্রিবেদী মশাই দরজার গায়ে আলতো ভাবে হাত রেখে। হঠাৎ এক বার নজর পড়ল নিজের বুকের ভেতর।

ক্ষুধার্ত্ত দেবতা ক্ষুব্ধ নেত্রে তাকিয়ে আছেন। ক্ষুধা তাঁর মেটে নি।

আকুল আবেদন জানালেন—"নাও, আরও বলি নাও। বিচার বলি দিয়েছি এবার বিকার বলি দোব। অন্তর্যামী, তুষ্ট আমি করবই তোমাকে। কিছুতেই আর ঠকাব না।"

"মুক্তা—মুক্তা—"

কপাটের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে চাপা গলায় ডাক দিলেন। বুক ফাটা তেষ্টার ডাক, স্পষ্ট ভাবে ফুটল না। দুম দুম করে আঘাত করলেন দরজায় দু বার। আবার ডাক দিলেন—মুক্তা মুক্তা। কপাটের গায়ে চেপে ধরেছেন নিজেকে, আরও নিবিড় ভাবে ডাক দিতে হবে। ডাকের মত ডাক দেওয়া চাই। ওধারের ঘরে রয়েছে ছোট ভাই ছোট ভায়ের স্ত্রী, তারা না আবার জেগে ওঠে। কেউ জেগে থাকলে চলবে না, চরাচর বিশ্ব ঘুমিয়ে থাকবে। সেই হল মাহেন্দ্রক্ষণ, মাহেন্দ্রক্ষণটিতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছেন। এখন শুধু ডাক দিয়ে জাগিয়ে তোলা আর বলার মত করে বলা—ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। আমি আছি। সময় পার হতে দিই নি আমি। আগুন খেয়ো না।

শুধু নির্ভয় করে দেওয়া। কারও কাছে যেতে হবে না, কারও কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হবে না, কোনও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকবে না, ভবিষ্যতের ভিত্তি পাষাণ দিয়ে গড়া রইল। দেখছ বুকের ছাতি-খানা, চোখ গেছে চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর, তাতে কি হয়েছে। হাত দু-খানায় এখনও যে শক্তি আছে, তা দিয়ে দশটা বিপুলকে পিষে গুঁড়ো করে দিতে পারি। তোমার চোখ দুটি দিয়ে দেখব, তুমি আমার দৃষ্টি-শক্তি। এই দৃষ্টিশক্তি কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে দেব না আমি। কিছুতেই কেউ আর এক বার আমাকে অন্ধ করতে পারবে না।

মুক্তা—মুক্তা।

আরও দুটি ডাক দিলেন, আরও চাপ পড়ল কপাটের গায়ে, চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর সমস্ত ভারটা পড়ল। নিজের ভার নিজে বইতে পারছেন না বলেই তো তিনি এসেছেন। নিজের ভার অকপটে সঁপে দিতে এসেছেন মুক্তার হাতে। মুক্তার ঘরের কপাট সে ভার সইতে পারবে কেন। হঠাৎ কপাট দুখানা খুলে গেল, চৌকাট ডিঙিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ত্রিবেদী মশাই। ঢুকে পড়লেন মুক্তার ঘরে। ঘরে ঢোকা মাত্রই শরীরের ভার পায়ের ওপর রইল না, ভারশূন্য হয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু—কিন্তু—ঘুম যে ভাঙল না!

ঘুম ভাঙাতে হবেই। লগ্ন যে বয়ে যায়।

মুক্তা—মুক্তা—

উঠে বসে দু বার ডাক দিলেন আবার, তার পর উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। আবার নিজের পায়ের ওপর নিজের ভারটা রাখতে হল। পা দুখানা তাঁকে বয়ে নিয়ে চলল মুক্তার বিছানাটার কাছে, বিছানাটা ঠিক কোন্‌খানে আছে তা তো তিনি জানেন না। পা দুখানার ওপর নিজের ভার রেখে দু হাত সামনে মেলে সারা ঘরখানায় ঘুরে

বেড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পা দুখানা তাঁকে মুক্তার চৌকির পাশে পৌঁছে দিল, চৌকির গায়ে গিয়ে ঠেকল পা দুখানা। আবার দু বার ডাক দিলেন ত্রিবেদী মশাই—মুক্তা—মুক্তা। ডাক দিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শেষে নুয়ে পড়লেন চৌকির ওপর। হাত দুখানায় মশারি ঠেকল না। ভয়ানক চমকে উঠলেন। মশারি নেই কেন? মশারি ফেলে নি কেন?

আরও বাড়িয়ে দিলেন দুখানা হাত, সারা চৌকির ওপর হাতড়াতে লাগলেন। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন চৌকির ধারে। হাত দুখানা এক করে এ হাতের আঙ্গুল ও হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে গলিয়ে মোচড় দিতে লাগলেন। মট মট করে শব্দ হল। হাত দুখানায় এসে গেল শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু। ক্ষুধার্ত হাত দুখানা সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে! হাতের আওতায় একবার তাকে পেলে হয়, যার জন্যে বঞ্চিত হল হাতের ক্ষুধা,—তাকে একবার হাতের আওতায় পাওয়া চাই। মট মট করে তার শরীরের সব কখানি হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছাড়বে।

হীরামন্ হাবেলীর সিঁড়িগুলোর ধাপ খুবই উঁচু উঁচু। তরতর করে নেমে আসবার সিঁড়ি নয় সেগুলো। যাদের নামা ওঠার জন্যে ঐ সিড়ি তৈরী হয়েছিল, তাদের চলনই ছিল আলাদা ধরনের। ওঠবার সময় তারা উঠত ধীরে ধীরে, নামবার সময় নামত তালে তালে। ওঠা নামা আর নামা ওঠা, কোনওটাতেই তাদের তেমন তাড়া ছিল না। তাড়া খেয়ে বেড়াবার মানুষ ছিল না তারা, কে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেলেন ত্রিবেদী মশাই। চোখ থাকলে গাঢ় অন্ধকারে অমন ভাবে নামতে পারতেন না। চোখ না থাকার ঐটুকুই সুবিধে। চোখওয়ালাদের পক্ষে অন্ধকারে চলা অসম্ভব। চোখ দুটো ঘুচলে অন্ধকারও ঘুচল। নির্ঝঞ্ঝাটে ছুটে চল যেখানে খুশি—কিবা আলো কিবা অন্ধকার—সবই সমান।

সিঁড়ির শেষ নামারও শেষ। নামলেই মাশুক মজলিস, প্রেম পাগলাদের পাগলাগারদ। হীরামন্ হাবেলীর অন্দরের সিঁড়ি ঐ পাগলা গারদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। তার পরে আর নামাতে পারে না। কাজেই তখন থামতে হয়।

থামলেন ত্রিবেদী মশাই।

পাগলা গারদের সামনে ওত পেতে থাকতে হবে। যাবে কোথায়! এবার কোথায় যাবে! দুখানা হাত খাই খাই করছে। খাবেই, একটি বার আওতার মধ্যে পেলে হয়। মড় মড় করে আগুন চিবিয়ে খেয়েছিল আগুনখাকী। ঠিক সেই ভাবে মড়মড় করে হাড় গুঁড়িয়ে খাবে। যাকেই পাক গ্রাসের মধ্যে, কোনও বিচার নেই। চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর দুখানা হাতে চারখানা হাতের শক্তি, চারখানা হাত হা হা করছে। দেখা যাক, কি করে পরিত্রাণ পায়!

পাগল গারদ মাশুক মজলিস মুখর হয়ে উঠল।

চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর চারখানা হাতের সবটুকু শক্তি জেগে উঠল নিমেষের মধ্যে। এতটুকু শব্দ একটু আওয়াজ কিছুতেই যেন না ফস্‌কায়। ধরা পড়া চাই, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ। কিছুতেই পরিত্রাণ নেই।

ধরা পড়ল।

দেখ, রোজ রোজ এই ঘরে আসা, কি যে পাগলামিতে পেয়েছে তোমাকে। সব দরজা খোলা রইল, দিদি পর্যন্ত নেই। মাথা ধরেছে বলে ছাতে গিয়ে শুয়েছে। যদি কিছু হয়—

কি হবে? কিছুই হবে না। জান—এই ঘরখানায় কেন আসি? তোমাকে নিয়ে এ ঘরে আসলে আমার কি মনে হয় জান? মনে হয় আমি এক জন সেই তখনকার দিনের নবাবজাদা, আর তুমি হলে খুব নামকরা এক বাইজী। তুমি নাচছ, আমি সেই তখনকার দিনের

অদ্ভুতদর্শন একটি পাত্র সামনে নিয়ে বসে আছি। তাতে রয়েছে টকটকে লাল—

আঃ, থাম। সকাল হলেই নবাবজাদাকে কলম পিষতে ছুটতে হবে, বাইজী যদি তাড়াতাড়ি ভাত না চাপায় তো উপোস করেই দৌড়—

সব মাটি করে দিলে। নাঃ, কেন যে মরতে কুমারী বিয়ে করতে গিয়েছিলুম। তার চেয়ে যদি ঐ বিপুলের মত বিধবা একটিকে নিয়ে আসতাম—

ঐ রকম মোটা আর ঐ রকম কালো একটি মেয়ে দারোগা জুটত। বয়ে যেত তার তোমার সঙ্গে সারারাত জেগে থাকতে। নাক ডাকিয়ে ঘুমোত পড়ে পড়ে। আবার নামটাই কি সাংঘাতিক—সংজ্ঞাসংবিদা দেবী। কি দেখে যে ওকে পছন্দ করলেন বিপুল বাবু—। নামটা উচ্চারণ করতেই দাঁত ভাঙবে।

তা ভাঙুক। কিন্তু তোমার দিদিটি কত দূর কি করলেন ? বড়দার মত করাতে পারলেন ? বিপুল বেচারা অত করে ধরল তোমার দিদিকে।

বয়ে গেছে দিদির। দিদি ও সব দু চক্ষে দেখতে পারে না। ঐ পাত্রী দেখাবার জন্যে সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছেন বিপুল বাবু, এ কথা জানলে দিদি মোটে যেতই না।

তবেই সেরেছে দেখছি। বিপুল বেচারা ওধারে আশা করে বসে আছে।

থাকুক, তুমি এখন চল। আজ ভোরে যে কাণ্ড ঘটেছে। ছুটে বেরিয়ে বড় ঠাকুরকে ছুঁয়ে ফেললাম একেবারে। ভাগ্যে ভোর বেলা কথা বলেন না। যদি সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করতেন—কে গেল ? যদি গোলমাল বাধাতেন ?

পাগলা গারদের ফিসফিসানি চলতেই লাগল।

ত্রিবেদী মশাই পিছু হেঁটে সিঁড়ির নীচের ধাপে পা দিলেন। পাগল হন নি তো তিনি যে পাগলা গারদের গায়ে কান পেতে পাগলা

পাগলীর পাগলামি শুনবেন।

সিঁড়িগুলোর ধাপ বড্ড উঁচু উঁচু। ভারী কষ্ট হয় ওঠবার সময়। কি দরকার অত কষ্ট করে।

যাচ্ছেনই বা কোথায়! সেই ঘরে!

কাঠগুলো যে সাজানো রয়েছে!

দুর্গন্ধ, ভয়ানক দুর্গন্ধ, হাড় মাংস পোড়া গন্ধ কি বিশ্রী! ও গন্ধ কিছুতেই ঢাকা পড়বে না। হলই বা মৈসুরী চন্দন আর বেল কাঠ। কোনও সাধ্য নেই ওদের মানুষ পোড়া গন্ধ লুকিয়ে ফেলবে।

দূর দূর, খামকা আবার কষ্ট করে ওপরে ওঠা।

যতটুকু উঠেছিলেন, নেমে এলেন। থাকুক কাঠ ঘি ধুনো গুগ্‌-গুল। ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করা আর পোষাবে না।

তেষ্টা কিন্তু খুবই পেয়েছে।

হন হন করে হাঁটতে লাগলেন মাশুক মজলিসের সামনে দিয়ে। মাশুক মজলিসের ফিসফিসানি কি আর কানে যায় তখন। তেষ্টা পেয়েছে কিনা ভয়ানক। জল না খেলে যে আর চলছে না।

পৌঁছলেন বাইরের উঠোনে, অনন্তদেবের মন্দির উঠোনের উত্তর সীমায়। মন্দিরটার কথা মনেই এল না। তেষ্টা পেয়েছে কিনা ভয়ানক। প্রকাণ্ড ফটকের গায়ের কাছে কাটা দরজাটা খুলে নীচু হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

তার পর সিঁড়ি। আর সিঁড়ির শেষে জল, মা গঙ্গা কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

হীরামন্ হাবেলীর ঘাটের সিঁড়িগুলো খুবই চমৎকার। কোনও

ভয় নেই, সোজা নেমে যাও যত দূর খুশি, সিঁড়ি ফুরবে না।

হীরামন্ হাবেলীর ছাতে আস্ত একটা শকুন-সংসার। ওরা গঙ্গা পাহারা দিচ্ছে। কোথাও যদি কিছু ভেসে ওঠে, অমনি সবাই উড়ে যাবে। তার পর আকাশ থেকে ঝপাঝপ পড়বে গঙ্গায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার উড়বে আকাশে। জননী জাহ্নবী ওদের আহার যোগান কিনা, তাই ওদের কোনও ভাবনা নেই।

ওধারে পাঁচ মন বেল কাঠ, সোয়া মন মৈসুরী চন্দন, এক টিন ঘি ধুনো গুগ্‌গুল কর্পূর সাজানো রইল হীরামন্ হাবেলীর দোতলার ঘরে। অনন্ত কাল সবুর করে থাকুক ওরা তাতে কার কি গেল এল।

কাঠ কিন্তু বড় ভয়ানক জিনিস। শুকিয়ে খটখট করছে, একটু রসকষ নেই কিন্তু আগুন লুকানো আছে ঠিক। কাঠে কাঠে ঘষা লাগলে কি সর্বনাশই না হয়। পুড়ে ছারখার হয় বন। আহা— কত পশু পাখী জীবজন্তু যে ধ্বংস হয়!

সাক্ষাৎ বৈশ্বানর হল কাঠ। ও জিনিসকে কখনও বিশ্বাস করতে আছে! কাঠের সঙ্গে এক ঘরে বাস—সর্বনাশ! ওর অন্তরে যে আগুন লুকিয়ে থাকে তার নামই হল দাবানল। দাবানল হল অন্তরের আগুন, অন্তরে লুকিয়ে থাকে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

সাবধান!

দাবানলকে সাবধান!

॥ শেষ ॥